এ ড্রামা ইন লিভোনিয়া

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

সীমান্তরেখা 2
নিকোলেফ পরিবার 40
ভাঙা ক্রুশের সরাইখানা 78
সরেজমিন তদন্ত 100
হত্যাকারী কে? 129
মুখোমুখি 160
আবার জেরা 178
কবরখানায় 202

সীমান্তরেখা

১. সীমান্তরেখা

আস্ত কালো রাতটায় লোকটি ছিলো একা।

দীর্ঘ শীতকাল ধরে বরফের স্তূপগুলো জমেছে একের পর এক, আর তারই উপর দিয়ে সে দৌড়চ্ছে নেকড়ের মতো মরীয়া ও হন্যে। কনকনে হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে পরেছে ডবল-পুরু কাপড়ের পাৎলুন আর কাফতান আর কানঢাকা টুপি–কিন্তু ছুরির ফলার মতো হিম হাওয়া তবু মাঝে-মাঝে গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। তার ঠোঁট আর হাত দুটি নীলবর্ণ হয়ে আছে, আঙুলের ডগাগুলোয় কোনো সাড় নেই। মিশকালো অন্ধকারের মধ্যে তবু সে সারাক্ষণ জোর করেই এগুচ্ছে; মাথার উপরে ঝুলে আছে ভারি নিচু মেঘ, হয়তো এক্ষুনি আবার শুরু হয়ে যাবে তুষারঝুরি। সময়টা এপ্রিলের গোড়ার দিক, কিন্তু জায়গাটা আটান্ন ডিগ্রিতে। কিছুতেই থামবে না–এটাই তার পণ, কারণ পরে হয়তো আর কখনো সে এক পা-ও এগুতে পারবে না।

রাত এগারোটা নাগাদ অবিশ্যি সে থামলো একবার। তার কারণ এই নয় যে তার পা দুটি তাকে আর বহন করতে পারছিলো না, কিংবা তার দম ফুরিয়ে এসেছিলো, অথবা অবসাদে সে প্রায় নেতিয়ে পড়েছিলো। তার বুকের জোর যতটা, শরীরেরও ততটাই। একবার কেবল সে চেঁচিয়ে বললে; শেষকালে সত্যিই সীমান্ত... লিভোনিয়ার সীমান্ত...আমার দেশের সীমান্তরেখা!

তার পায়ের কাছেই পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর-হাত বাড়িয়ে সে একবার অভিবাদন করে নিলে সেই বিশাল বরফ ঢাকা মাটিকে। তারপর শাদা তুষারঝরা মাটির উপর চাপ দিয়ে দিয়ে সে হাঁটতে লাগলো–যেন এখানে সে চিরকালের উদ্দেশে তার পায়ের ছাপ রেখে যেতে চায়।

অনেক দূর থেকে এসেছে সে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে। সাহসে ভর করে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে পথের বিপদের, তুচ্ছ করেছে সে সমস্ত ভয় আর আতঙ্ক, তার সহ্যশক্তি নাড়া খায়নি কিছুতেই। পুরো দু-মাস ধরে সে সূর্যাস্ত লক্ষ্য করে ছুটে আসছে, পেরিয়ে এসেছে অনন্ত স্তেপি, কশাকদের পাহারা এড়াবার জন্যে কতবার যে নানা কষ্টের মধ্যে দিয়ে ঘোরাপথে ছুটতে হয়েছে তাকে, উঁচু পাহাড়ের বন্ধুর ঘোরানো গিরিখাত পেরিয়েছে সে নিভীক ও একাগ্রভাবে, এমনকী রুশ সাম্রাজ্যের একেবারে মাঝখানেও যেতে সে পেছ-পা হয়নি, যদিও জানে যে সেখানে কড়া পাহারা আছে পুলিশের। একবার মুখোমুখি পড়লেই তার প্রাণ যেতো, কিন্তু অবশেষে দৈবের দয়াতেই সে পেরিয়ে এসেছে তাদের, আর তারপর এখন আবেগভরা গলায় শুধু বলে উঠেছে সীমান্ত...লিভোনিয়ার সীমান্ত।

অত বছর পরে, অবশেষে, সে কি তাহলে ফিরে আসছে আতিথ্যেভরা তার দেশের মাটিতে? আর তবে তার কিছু ভয় নেই? তার নিরাপত্তার কোনো বিঘ্ন নেই আর? বন্ধুরা অপেক্ষা করে আছে তার জন্য? স্নেহে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবে বলে কি অপেক্ষা করে আছে আত্মীয়পরিজন? তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা কি রয়েছে এখানে? উৎকণ্ঠায় ভরে গিয়ে উগ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করে আছে তারই ফিরে আসার জন্য? না কি

আচমকা হাজির হয়ে পড়ে সব্বাইকে সে তাক লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে? কাউকেই হয়তো সে জানায়নি যে সে এত শীগগির ফিরে আসবে?

না। এর কোনোটাই নয়। এটা কেবল তার আরো-দুরে পালাবার পথের রাস্তা। সবচেয়ে কাছের সমুদ্রবন্দরে গিয়ে পৌঁছুতে চাচ্ছে সে, যেখানে গিয়ে কারু মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে সে একটা জাহাজ ধরতে পারবে। লিভোনিয়ার উপকূল পিছনের দিগন্তে মিলিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই, তার নিরাপত্তা নেই।

সীমান্ত! দেখেই সে বলে উঠেছিলো। কিন্তু এ কী ধরনের সীমান্ত? কোনো চিহ্ন নেই, যা দেখে বোঝা যায়। নেই কোনো খুঁটি, জলের ধারা বা গিরিশ্রেণী; এমনকী কোনো জঙ্গলও নেই। তাহলে কি কেবল একট কল্পিত রেখা দিয়েই দেশ দুটি ভাগ করা? কোনো প্রাকৃতিক বিভাজক নেই দু-দেশের মধ্যে?

রুশ সাম্রাজ্য আর তিনটি বলটিক দেশের সীমান্ত এটা। বলটিক দেশ তিনটি হলো এস্তনিয়া, লিভোনিয়া ও কুরল্যাণ্ড। লেক পেইপুসকে উত্তরে দক্ষিণে ভাগ করে গেছে সীমান্ত-শীতকালে তার তল থাকে নিরেট, তুষারজমা; আর গ্রীষ্মকালে তরল, স্রোতোময় জলধারা গর্জায়।

+

বয়েস তার চৌত্রিশ, ঢ্যাঙ, শক্ত গড়ন, বুকের খাঁচা মস্ত, পেশিবহুল, পা ফেলার ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্বের ছাপ। কানঢাকা টুপির তলায় ঘন সোনালি দাড়ি দেখা যাচ্ছে–হাওয়ায় যখন টুপির কানা মাঝে-মাঝে সরে যায়, দেখা যায় উজ্জ্বল দুটি জ্বলন্ত চক্ষু–সেই হিম ঝড়েও

তাদের দীপ্তি একফোঁটাও কমেনি। চওড়া কোমরবন্ধের আড়ালে গোঁজা একটা ছোট্ট চামড়ার থলি,তাতেই তার যথাসর্বস্ব-কেবল কয়েকটা কাগজের নোট, কয়েকটাই মাত্র রুবল–দূরে কোথাও যাবার খরচ তাতে কিছুতেই কুলোবে না। আর যা জিনিশ আছে তার কাছে, তা হলো একটা ছ-ঘরা রিভলবার, চামড়ার খাপে মোড়া একটা ধারালো ছুরি, একটা থলিতে সামান্য-কিছু খাদ্য, একটা ফ্লাস্ক ভর্তি মদ, একটা শক্ত ছড়ি। খাবারের থলি, ফ্লাস্ক, টাকার থলি–এ-সব তার কাছে অস্ত্রগুলোর মতো তত দামি মনে হয় না। নেকড়েরা কিংবা পুলিশের লোক আক্রমণ করলে এগুলো সে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করে আছে। সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকে সে, কেবল রাতেই বেরোয় রাস্তায়: ফিল্যাণ্ড প্রণালী বা বলটিক সাগরের কোনো একটা বন্দরে গিয়ে পৌঁছুতে হবে তাকে, পৌঁছুতে হবে সকলের অগোচরে। কোনো পাসপোর্ট নেই তার, তবু এই বিপজ্জনক দীর্ঘ পথ এ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু তীরের কাছে পৌঁছলে কাজটা এত সহজ হবে বলে মনে হয় না–সেখানে পাহারা আরো কড়া, সেখানে সঙিন উঁচনো লোক দাঁড়িয়ে আছে তারই অপেক্ষায়।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে এই ফেরার মানুষটার কথা এতক্ষণে সর্বত্র রটে গিয়েছে–তার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে এতক্ষণে, কিন্তু রাজনৈতিক বন্দী না নিছক আইন ভাঙিয়ে হিশেবে তার নামে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেছে, তা সে জানে না। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ঠিক যে পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এতদিন ধরে দৈব তার উপর ছিলো প্রসন্ন, কিন্তু এই লিভভানিয়ার সীমান্তে অদৃষ্ট যদি তাকে ছেড়ে যায়, তাহলে তার সব আশাই বন্দরের জলে ডুবে যাবে।

কিন্তু কে সে? কে এই ফেরারি?

গ্রীষ্মকালে লেক পেইপুসে মাঝে মাঝে ভিড় করে জেলেডিঙি আর মালের নৌকো। কিন্তু এই অক্ষরেখায় বসন্ত আসে দেরি করে–হ্রদটা এখন আর নৌচালনার যোগ্য নয়–এখন হ্রদের উপর দিয়ে সদলবলে সাঁজোয়া গাড়িশুদ্ধ অনায়াসেই এক গোলন্দাজবাহিনী পেরিয়ে যেতে পারে, কারণ দীর্ঘ শীতকালের ঠাণ্ডায় সব জল জমে নিরেট বরফ হয়ে গেছে। কোনো মস্ত সমতলের মতো ধবল-কঠিন পড়ে আছে আস্ত হ্রদটা–আর বরফের চাঙড়গুলো পড়ে আছে । জড়াজড়ি করে, স্তূপের মতো।

ফেরারি চলেছে এই ভীষণ তুষারবনের মধ্য দিয়েই। কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না তার, নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত পায়ের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই তল্লাটটা বুঝি তার চেনা : সকাল হবার আগেই সে হ্রদের পশ্চিম তীরে পৌঁছে যাবে।

এখন রাত দুটো বাজে, মনে-মনে সে হিশেব করছিলো, আরো কয়েক মাইল গেলেই ওখানে কোথাও নিশ্চয়ই জেলেদের ফাঁকা কুঁড়েবাড়ি পাওয়া যাবে–বাকি রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে দেয়া যাবে। এর পর থেকে আমাকে আর হুড়মুড় দুদ্দাড় করে যেতে হবে না।

সব অবসাদ সে গা থেকে ঝেড়ে ফেললল। এতক্ষণে তার আস্থাও ফিরে এসেছে। পুলিশ আর তার হদিশ জানে না সম্ভবত। যদি বা দুর্ভাগ্যবশত আবার তারা তার সন্ধান পেয়ে যায়, তাহলে কী করে তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে, তা সে জানে।

হ্রদটা পেরুবার আগেই সকাল হয়ে যাবে কিনা, এটাই তার ভয় এখন। সেইজন্যই সে যেন একটা শেষ চেষ্টা করলে। ফ্লাস্ক খুলে ঢকঢক করে মদ ঢেলে দিলে গলায়, বেশ চাঙ্গা লাগলো; মুহূর্তও না-থেমে আরো তাড়াতাড়ি করে সে ছুটতে লাগলো।

অবশেষে চারটে নাগাদ দিগন্তে দেখা গেলো এলোমেলো কতগুলো বেঁটেখাটো গাছ-তুষার পড়ে ডালগুলো শাদা হয়ে আছে।

লেক পেইপুসকে দু-ভাগ করে গেছে লিভোনিয়ার সীমান্ত, কিন্তু কাস্টমসের ঘাঁটিগুলো বসানো সীমান্ত থেকে একটু দূরে। হ্রদের পশ্চিম তীরে গ্রীষ্মকালে যেখানে নৌকোগুলো ঘাটে লাগে, ঘাঁটিগুলো সেখানেই বসানো।

তা সে জানে বলে দূরে কুয়াশা চিরে একটা হলদে আলো জেগে উঠতেই সে মোটেই অবাক হলো না। কেবল একটা মস্ত বরফের স্তূপের আড়ালে থেমে পড়ে সে বোঝবার চেষ্টা করলে আলোটা নড়ছে কি না।

আলোটা যদি নড়েচড়ে বেড়ায়, তাহলে নিশ্চয়ই মশালের আলো হয়তো কাস্টমসের লোকেরা মশাল হাতে রোঁদে বেরিয়েছে। এবং পারতপক্ষে তাদের ধারে-কাছে না-ঘেঁষাই ভালো। স্থির আলো হলে বোঝা যাবে যে কাস্টমসের কোনো ঘাঁটিতে জ্বলছে। কারণ জেলেদের কুঁড়েবাড়িগুলো এখনও ফাঁকাই আছে; এপ্রিলের মাঝামাঝি বরফ গলে গেলেই তারা ফিরে আসবে। কাজেই ওই আলোর কাছে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে-হয় একটু এ-পাশে সরে যেতে হবে তাকে, নয়তো অন্য পাশ দিয়ে।

বাঁ দিকটাই সে বেছে নিলে। ভোররাতের হাওয়ায় কুয়াশা একটু-একটু করে পাতলা হয়ে যাচ্ছে, আর তারই আড়াল থেকে এ-পাশে দেখা যাচ্ছে গাছপালার ঘন সারি–ডানদিকে অতটা ঘনভাবে গাছপালা গজায়নি। যদি কেউ তার পিছু নেয়, তাহলে চট করে গাছের

আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারবে সে–এমনকী গাছপালার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাওয়াও হয়তো তেমন কঠিন হবে না।

পঞ্চাশ পা গেছে কি না-গেছে, হঠাৎ ডানদিক দিয়ে আওয়াজ উঠলো গম্ভীর ও ভারিক্কি : হুকুমদার!

উচ্চারণের ভঙ্গিটা টিউটনিক, ঠিক যেন আলেমান ত্বের ডা! শোনালো কথাটা, আর তার কানে এই হুকুমদার কথাটা মোটেই মোলায়েম বা মধুর ঠেকলো না। অথচ বালটিক দেশগুলোয় আলেমান কথাই বলে লোকে–ঠিক চাষীরা হয়তো বলে না, কিন্তু শহুরেদের মুখে আলেমান খুব চলে।

সে–ফেরারি–এ কথার কোনো সাড়াই দিলে না। সোজা মুখ থুবড়ে সটান পড়ে গেলো সে বরফের উপর লম্বালম্বি। ভাগ্যিশ সে শুয়ে পড়ছিলো, কারণ তক্ষুনি গুড়ুম করে আওয়াজ হলো বন্দুকের–আরেকটু হলেই গুলিটা ঠিক তার বুকে গিয়ে লাগতো। কাস্টমসের লোকেরা রোদে বেরুলে পালাতে পারবে কি সে? নিশ্চয়ই তারা তাকে দেখে ফেলেছে, কোনো সন্দেহই নেই তাতে...ঐ হুকুমদার! আর গুলির শব্দই তার প্রমাণ...কিন্তু এই কুয়াশা আর ছায়ার মধ্যে হয়তো তারা এখুনি ভাবতে শুরু করেছে যে সমস্তটাই তাদের চোখের ভুল...

অনুমানটায় বোধকরি ভুল হয়নি। ধাবমান লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে এটাই তার মনে হলো।

লেক পেইপুসের কাস্টমসের ঘাঁটির লোক তারা। বেচারিরা! সবজে রঙের উর্দি নোংরা হয়ে-হয়ে হলদে হয়ে গেছে তাদের; বখশিশের বা উৎকোচের জন্য সারাক্ষণ তারা হাত বাড়িয়েই আছে–এত কম বেতন পায়! সংখ্যায় তারা দুজন, টহল দিয়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিলো, এমন সময় মনে হলো বরফের চাঙড়গুলোর মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি নড়ে বেড়াচ্ছে।

ঠিক দেখেছো তো? না কি চোখের ভুল? জিগেশ করলে একজনে।

ঠিকই দেখেছি,অন্যজন বললে, নিশ্চয়ই কোনো স্মাগলার–চোখে ধুলো দিয়ে লিভভানিয়ায় ঢুকে পড়তে চাচ্ছিলো!

এবারকার শীতে ও-ই প্রথম স্মাগলার নয়–এবং শেষজনও নয়–হয়তো এখনও লোকটা প্রাণপণে ছুটছে-না-হলে তার কোনো হদিশই পেলুম না কেন!

তা আর কী করবে? যে গুলি ছুঁড়েছিলো, সে বললে, এই কুয়াশায় ঠিকমতো তাগ করা যায় নাকি! ইশ! ভারি আপশোশ হচ্ছে, লোকটাকে পেড়ে ফেলতে পারলে দিব্যি হতো...স্মাগলারদের ফ্লাস্ক সবসময়েই ভর্তি থাকে...এই ঠাণ্ডায় দিব্যি দুজনে মিলে ফ্লাস্কটা ভাগাভাগি করে নিতে পারতুম!

এখন তো জঠরের মধ্যেটা গরম করে নেবার কোনো সুযোগই নেই, ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করলে অন্যজনে।

খোঁজাখুঁজি ছাড়লে তারা। বিশেষ করে দু-এক ঢোক স্নাপ বা ভোদকা মিলতে পারে, এই লোভেই তারা তল্লাশি চালিয়ে গেলোস্মাগলারটি সম্বন্ধে কোনো মাথাব্যথাই নেই তাদের। কিন্তু খোঁজাখুঁজিই সার হলো–কোথাও কারু কোনো হদিশ নেই।

কাস্টমসের পাহারাওলারা দূরে সরে গেছে বলে যেই মনে হলো, অমনি ফেরারি বরফের উপর থেকে উঠে দাঁড়ালে। সকালের আগেই একটা পরিত্যক্ত ও ফাঁকা পোড়ো বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলে সে-কুঁড়েবাড়িটা কাস্টমসের ঘাঁটি থেকে অন্তত দু-মাইল দক্ষিণে হবে।

অন্য সময় হলে সে নিশ্চয়ই খুব সাবধানে সারাদিন ধরে নজর রাখতে সন্দেহজনক কেউ এসে এখানে হাজির হয় কিনা-যাতে কাস্টমসের লোকেরা তল্লাশিতে বেরুলে, কুঁড়েবাড়ির কাছে হাজির হলে চটপট চম্পট দেয়া যায়। কিন্তু অবসাদে তার সর্বাঙ্গ যেন ভেঙে পড়ছিলো; সহ্যশক্তি তার যতই বিপুল হোক না কেন, এখন আর সে কিছুতেই ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে না। এক কোনায় লম্বালম্বি শুয়ে পড়লো সে কাফতান মুড়ি দিয়ে; সেই গভীর ঘুম যখন তার ভাঙলো, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো বেলা বাজে তিনটে। ভাগ্যিশ কাস্টমসের লোকেরা আর ঘাঁটি ছেড়ে বেরোয়নি–রাত্তিরে একটা গুলি চালিয়েই তারা বেশ সহজেই জেনে নিয়েছে যে পুরোটাই ছিলো কুয়াশার মধ্যে চোখের ভুল। দেশের মাটিতে পা দেবা মাত্রই প্রথম বিপদ–কিন্তু সেটাকে কাটাতে পেরেছে বলে সে নিজেকেই অভিনন্দন দিয়ে ফেললে।

ঘুমিয়ে উঠে বেশ ঝরঝরে আর চাঙ্গা লাগছে। এখন একটু খাবার-দাবার চাই। তার থলিতে খাদ্য যা অবশিষ্ট আছে, তাতে দু-একবার মাত্র চলবে কিন্তু পরবর্তী কোথাও আশ্রয় নেবার আগেই তাকে কিছু খাবার জোগাড় করে নিতে হবে। চাই ফ্লাস্ক ভর্তি করে স্নাপ–কারণ শেষ ফোঁটা অবধি সে কাল রাত্তিরে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিয়েছিলো।

অন্তত চাষীরা আমাকে কখনো ফেরায়নি, নিজেকে সে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করলে, আর লিভোনিয়ার চাষীরা কি তাদের মতোই কোনো স্লাভকে বিমুখ করবে? নিশ্চয়ই না।

ঠিকই ধরেছিলো সে। যদি কোনো আলেমান চাষীর পাল্লায় না-পড়ে, তাহলে তার আর কোনো চিন্তা নেই, স্লাভরা তাকে কিছুতেই ফেরাবে না। তবে আলেমান চাষীর সংখ্যাও এ তল্লাটে নেহাৎ কম নেই। কোনো রুশকে তারা নিশ্চয়ই স্বাগতম জানাবে না।

তবে সে তো আর দান চাইবে না–এখনো তার কাছে কয়েক রুবল অবশিষ্ট আছে। ঐ রুবলগুলো দিয়েই শেষ পর্যন্ত চলে যেতে পারবে সে–অন্তত লিভোনিয়া পর্যন্ত তো যেতে পারবে। এটা ঠিক যে কোনো-একটা জাহাজে গিয়ে উঠতে হবে তাকে। কিন্তু জাহাজে চড়বে সে কী করে?...সে কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে। সবচেয়ে জরুরি এবং প্রাথমিক কাজ হলো কিছুতেই ধরা না-পড়া ও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে উপকূলের কোনো-একটা বন্দরে গিয়ে পৌঁছনো। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন তাকে সব চেষ্টা করতে হবে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ যখন বেশ অন্ধকার হয়েছে বলে মনে হলো, তখন সেই ফেরারি প্রথমে তার রিভলবারটায় গুলি ভরা আছে কি না দেখে নিয়ে বেরিয়ে– পড়লো।

সারাদিন ধরে বাতাস বয়েছে দক্ষিণমুখো, তাপমাত্রা ছিলো প্রায় বরফ-জমানো, হিমাঙ্কর একটু উপরে; বরফের মধ্যে ছোটো-ছোটো কালো ফুটকিগুলো দেখে বোঝা গেলো যে তুষার গলা শুরু হলো বলো।

ভূদৃশ্য কিন্তু একটুও পালটায়নি; এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর কোনো পথিকের কাছেই বাধার সৃষ্টি করবে না–যদি-না বরফ গলে গিয়ে পা রাখাই বিষম বিপজ্জনক হয়ে ওঠে–আর কেবল সেই ভয়টাই এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজেই বন্দরে গিয়ে পৌঁছনোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ এখন; বরফ যদি হঠাৎ অসময়েই গলে যায় তাহলে একদিক থেকে ভালোই-নৌ-চলাচল সম্ভব হবে তাহলে।

হ্রদ আর এক্স শহরের মধ্যে দূরত্ব হবে প্রায় আট মাইল। সকাল ছটা নাগাদ ফেরারি গিয়ে এক্স-এ পৌঁছুলো । কিন্তু তখনো সে একটুও অসাবধান হয়নি। শহরে ঢোকবার চেষ্টা সে তখন করলেই না। ঢুকতে গেলেই পুলিশ তার কাছে কাগজপত্তর দেখতে চাইবে–আর মস্ত ঝামেলা শুরু হবে। শহর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা ফাঁকা কুঁড়েবাড়িতেই সে সারাদিন কাটিয়ে দিলে।

সন্ধে ছটা নাগাদ সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে চলতে শুরু করে দিলে; প্রায় সাত মাইল হেঁটে আসার পর পৌঁছলো এমবাখ নদীর তীরে–হ্রদের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে হ্রদের সঙ্গে মিশেছে নদীটা। এখানে এসে হ্রদের তীরে ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা তার নিরাপদ মনে হলো না–বরং হ্রদের উপর দিয়ে এগুনোই ভালো, বিশেষত হ্রদের জল যখন এখনো জমাট বেঁধে নিরেট ও কঠিন হয়ে আছে।

বৃষ্টি পড়েছিলো মুষলধারে, আর তাতেই বরফ গলার সাহায্য হচ্ছিলো–চারপাশেই বরফ গলার সব লক্ষণ বিদ্যমান। শিগগিরই হয়তো বরফের মধ্যে দেখা দেবে একের পর এক ফাটল আর জলের ধারা।

সকালের আগেই হ্রদের শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছনো চাই–ফেরারি দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো। যেতে হবে তাকে পনেরো মাইল–কোনো ক্লান্ত। লোকের পক্ষে সেটা আরো অবসাদজনক–তার উপর এই টানা রাস্তাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো। কাল যে দশ ঘন্টা সময় সে বিশ্রাম নেবে, সেটা সে সত্যিই অর্জন করবে, বলা যায়।

কপাল মন্দ, না-হলে কি বৃষ্টিবাদল শুরু হয়ে যায় হঠাৎ! শুকনো ঠাণ্ডা হলে আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারতো সে। এটা ঠিক যে মাটির চেয়ে নিরেট বরফের উপরেই পা ফেলতে পারবে সে অনায়াসে, মাটির উপরে নিশ্চয়ই বরফ-গলা জলে কাদা হয়ে গেছে, আর পা পিছলে যাবারও সম্ভাবনা। কিন্তু চড়চড় করে শব্দ হচ্ছে বরফের উপর, বোঝা যাচ্ছে যে বরফ ফাটতে শুরু করেছে, এর পরেই জলের উপর আলাদা-আলাদা অসংলগ্ন বরফের চাঙড় ভাসতে থাকবে। তাতে আবার আরেক মুশকিল দেখা দেবে-নদী পেরুতে হবে তাকে, কোনো উপায় বার করতে না-পারলে হয়তো সাঁৎরে পেরুতে হবে ঐ ঠাণ্ডা জল। আর তাতে সব জায়গাতেই তার অনেকক্ষণ করে দেরি হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা বোঝামাত্র লোকটা যেন অতিমানুষিক শক্তি পেলো তার শরীরে। আঁটো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে সে কাফতান, জলের ছাঁটের হাত থেকে সেটাই তাকে রক্ষা করবে। জুতোজোড়াও বেশ মজবুত আছে–ভাগ্যিশ কয়েকদিন আগেই জুতোজোড়া সে এক মুচিকে দিয়ে সারাই করে নিয়েছিলো, না-হলে এই পিছল বরফে পা ফেলতো কী

করে? তাছাড়া অন্ধকার সত্ত্বেও রাস্তা খুঁজে হাড়ে মরার ভয় নেই–কারণ এমবাতাকে সরাসরি তার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

রাত তিনটে নাগাদ সে প্রায় বারো মাইল রাস্তা পেরিয়ে এলো। আর দু-ঘন্টার মধ্যে গিয়েই পৌঁছুতে পারবে গোপন আশ্রয়ে। এবারও কোনো গাঁয়ে ঢুকে পড়ে সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নেবার ঝুঁকি না নেয়াই ভালো, কী দরকার। ঐ ঝামেলা পুইয়ে, সঙ্গে যা খাবার আছে তাতে আরো একটা দিন কাটিয়ে দেয়া যাবে। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিলো, তাতে কিছুই এসে-যায় না;সন্ধে অব্দি কোনোরকমে নিরাপদ থাকাটাই হচ্ছে আসল কথা। হ্রদের উত্তরধারে যেসব বন আছে, সেখানে শিকারীদের কুঁড়েবাড়ি মিলবে নিশ্চয়ই–কেবল শীতকালেই ও-সব বাড়িতে লোকে আশ্রয় নেয়। ভিতরে থাকবে কয়লার স্তূপ, গাছপালার শুকনো ডালপালাও থাকবে নিশ্চয়ই ভিতরে–দিব্যি একটা আগুন জ্বালানো যাবে–তার আঁচেই শরীর মন সেঁকে নেয়া যাবে। এই মস্ত ফাঁকা জায়গায় ঐ অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়া উঠলেও ভয় নেই–কে আর আসবে এখানে তার খোঁজে!

বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছিলো এবার শীতে; কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডায় বিষম কষ্ট পেলেও পালাবার পক্ষে শীতকাল তাকে বেশ সাহায্যই করেছে।

হঠাৎ এমবাচ্-এর বামতীর থেকে একটা চাপা রাগি গর্জন রাত ছুঁড়ে বেরিয়ে এলো! কোনো সন্দেহই নেই–কয়েক শো গজ দূরেই কোনো বুনো জানোয়ার রয়েছে ওৎ পেতে। ওৎ পেতে আছে, না এদিকে এগুচ্ছে! বড্ড অন্ধকার–কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলে। সাবধানে থাকতে হবে তাকে, খেয়াল রাখতে হবে চারপাশে; জন্তুটা যাতে আচমকা তার উপর ঝাপাতে না পারে, সেদিকটায় নজর রাখতে হবে তাকে।

কালো রাতটাকে ছিঁড়ে-ছিড়ে আরো-কয়েকবার উঠলো সেই বিষম রাগি গর্জন! ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে শব্দটা! আর তার ডাকে সাড়া দিয়েই আরো-সব জন্তুদের বিলম্বিত ডাক উঠছে অন্ধকারে! হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েছে তারা অন্ধকারে রক্তের নেশায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

তার পরেই সেই বুকের রক্ত ঠাণ্ডা করে-দেয়া ঐকতান উঠলো এত জোরে ও এত কাছে যে তার মনে হলো বুঝি-বা তার উপরে ঝাঁপিয়েই পড়ে জন্তুগুলো!

নেকড়ে...নেকড়ের পাল!ফিশফিশ করে দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, বড্ড কাছ থেকে ডাক উঠছে–নিশ্চয়ই খুব দুরে নেই।

ভীষণ বিপদের সম্ভাবনায় তার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাইলো। কর্কশ ও কঠিন শীতকাল কেটেছে অনাহারে-জন্তুগুলো যে হন্যে হয়ে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। নেকড়ে যদি একটা হতো, তাহলে সে এতটা ভয় পেতো না। গায়ে যদি জোর থাকে, মাথা যদি ঠাণ্ডা থাকে, আর হাতে যদি থাকে লাঠি-তাহলে একটা নেকড়ে তার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু এ-রকম ছ-সাতটা জন্তু একসঙ্গে চড়াও হলে সে কী করবে–কী করে সে এদের তাড়াবে; এমনকী রিভলবারই বা কোন্ কাজে লাগবে? যদি একটাও তাগ না ফশকায়, তাহলে অবশ্যি–

আর আশ্রয়? এদের ক্ষুধার্ত কামড় থেকে রক্ষা পাবার উপযোগী আশ্রয়? পাগল! তা সে পাবে কোথায় এখানে। এমবাখ-এর তীর বেশ ঢালু ও নিচু–আর একেবারেই ফাঁকা। কোথাও গিয়ে যে কোনো গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়বে, সে-রকম কোনো গাছই নেই কোথাও! কোন্খান দিয়ে আসছে নেকড়েরা? বরফের উপর দিয়ে? না কি স্তেপি পেরিয়ে? এটা ঠিক যে আর পঞ্চাশ গজ দূরে নেই তারা!

যত জোরে পারে, তাকে ছুটতে হবে–এ ছাড়া আর কিছুই করার নেই! দৌড়ের পাল্লায় যে জন্তুগুলোর সঙ্গে পারা যাবে তারও কোনো ভরশা নেই। কিন্তু শেষ চেষ্টা করে দেখুক একবার–তারপর না-হয় তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। তাই সে করলে। কিন্তু ছোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই পিছনে একটা হন্যে চিৎকার উঠলোবোধহয় কুড়ি পাও দূরে নেই নেকড়েগুলো। থামতেই তাকিয়ে দ্যাখে অন্ধকারের মধ্যে ঝকঝকে চুল্লির মতো সারি-সারি জ্বলন্ত চোখ!

নেকড়ের চোখ–ক্ষুধায় আর লোভে জ্বলন্ত। দীর্ঘ উপবাসের পর সামনেই শিকার–চোখা হলদে দাঁতের পার্টির কাছেই। ক্রুদ্ধ গর্জন উঠলো রোগা চিমশে ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলোর।

এক হাতে তার লাঠি, আরেক হাতে রিভলবার–সে মুখোমুখি দাঁড়ালে নেকড়েগুলোর। লাঠির ঘায়েই যদি কাজে হয়, তবে আর রিভলবার ছুড়বে না–রিভলবারের গুলিতে ওদিকে আবার পুলিশ আর পাহারা সজাগ হয়ে উঠবে!

কাফতানের ভাঁজ থেকে হাত বার করে এনে সোজা সে দাঁড়ালে স্থির পায়ে। বনবন করে ঘুরলো তার হাতের মস্ত লাঠি-ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে নেকড়েগুলো থমকে গেলো। তবু

একটা নেকড়ে তার ঘাড় তাগ করে লাফ দিয়েছিলো, লাঠির ঘায়ে সে ছিটকে পড়লো মাটিতে।

কিন্তু নেকড়েরা সংখ্যায় আধ ডজন-কজনকে সে ভয় দেখাবে? রিভলবার ছুঁড়ে একটা-একটা করে সবগুলোকে খতম না-করলে আর চলবে না। আরেকটা নেকড়ের মাথায় সে ঘা মারলে প্রাণপণে-নেকড়ের মাথার খুলিটা ফেটে গেলো, কিন্তু তার হাতের লাঠিটা ভেঙেও দু-টুকরো!

আবার সে প্রাণপণে ছুটলো। নেকড়েগুলো মৃত সঙ্গীদের চেটেপুটে খেলে সেখানে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই হাড়গোড় ছাড়া বরফের উপর কিছু রইলো না। আবার তারা তার পিছনে ধেয়ে এলো। থামলো সে আবার, ফিরে দাঁড়িয়ে পর-পর গুলি ছুঁড়লো চারবার।

দুটি নেকড়ে ছিটকে পড়লো বরফে, মারাত্মক জখম হয়েছে তারা, রক্ত ঝরছে গলগল করে। কিন্তু শেষ গুলি দুটো ফশকালোবাকি নেকড়ে দুটো লাফিয়ে সরে গেলো একপাশে, আর তারপরেই ধেয়ে এলো তার দিকে। রিভলবারে গুলি ভরারও আর সময় নেই। দুশো গজ ছুটে যেতে না যেতেই একটা নেকড়ে কামড়ে ধরলে তার কাফতান–হ্যাঁচকা টানে চামড়াটা গেলো ছিঁড়ে, খপ করে সেই চামড়ার টুকরোই গিলে ফেললে নেকড়েটা।

নেকড়ে দুটোর তপ্ত ফোঁশফোঁশ গায়ে লাগছে তার। একবার যদি গলন্ত বরফে পা হড়কে যায়, তাহলেই সব শেষ–আর তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে না, মুহূর্তের মধ্যেই হিংস্র নখগুলো তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

তাহলে এই তার জীবনের শেষ ঘণ্টা! এত কষ্ট, এত বিপদ, এত অবসাদ-সব সহ্য করে সে ফিরে আসতে চাচ্ছে নিজের দেশে–কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের মাটিতেও সে মরতে পাবে না!

প্রথম ঊষার রশ্মি জেগে উঠলো দিগন্তে, আর তারই সঙ্গে দেখা গেলো হ্রদের শেষ মাথা। এখন আর বৃষ্টি পনছে না। হালকা কুয়াশায় মুড়ি দিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে চারপাশ। নেকড়েগুলো লাফিয়ে পড়লো শিকারের উপর। শেষ দুটো গুলি স্তব্ধতাকে ফেঁড়ে দিয়ে বেজে উঠলো গুড়ুম! গুড়ুম! রিভলবারের বাঁট দিয়ে সে পাগলের মতো মারছে নেকড়েগুলোকে দাঁতের আর নখের আঁচড় তাকেও রক্তাক্ত করে দিয়েছে!

হঠাৎ লোকটা গিয়ে একটা মইয়ের গায়ে ধাক্কা খেলো!...কোথায় উঠে গেছে এই মই?...কী এসে যায়? একবার উঠে গেলে নিশ্চিন্ত, নেকড়েগুলো মই বেয়ে উঠতে পারবে না পিছন-পিছন–অন্তত একটুক্ষণের জন্য তো নিরাপদ।

হেলানো মইটা কিন্তু মাটি অব্দি নামেনি। আশ্চর্য, যেন ঝুলে আছে উপর থেকে। উপরে কী আছে কুয়াশায় তা দেখা যাচ্ছে না।

শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো সে মই। নেকড়েরা যেই তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপাবে, নিচের ধাপে সে পা দিলে। হুড়মুড় করে উঠতে গিয়ে টের পেলে জুতোর সুখতলাই কামড়ে ছিঁড়ে নিলে নেকড়েগুলো।

মইটা তার ভারে মড়মড় করছে দুলছে শূন্যে অনবরত। ভেঙে পড়বে না কি? ...তাহলে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তাকে নেকড়েগুলো–আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে নেবারও তর সইবে না...

বেশ শক্ত মইটা। একেবারে শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছলো সে হুড়মুড় করে। একটা থাম বেরিয়ে আছে, পুরু একটা অক্ষদণ্ডর মতো–তারই উপর সে বসলো পা ঝুলিয়ে।

যাক! নেকড়েদের নাগালের বাইরে তো পৌঁছনো গেলো।

জানোয়ার দুটো তখনও ভীষণ গরজাচ্ছে, ফেঁশফোঁশ করছে রাগে আর লাফিয়ে লাফিয়ে মইটাকে পাকড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

.

২. একজনের জন্যে আরেকজন

এবার সে নিরাপদ–আপাতত। নেকড়েরা তো তার ভলুকদের মতো মই বেয়ে উঠতে পারে না কিন্তু যতক্ষণ না কেড়ে দুটো পালিয়ে যায় ততক্ষণ অবদি তার পক্ষেও আর নিচে নামা সম্ভব হবে না, আর নেকড়েরা যে দিনের আলো না ফুটলে পালাবে না, সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই মইটা এখানে করছে আর কীসের সঙ্গেই বা মইটা ঠেশ দিয়ে রাখা? কীসের থেকে মইটা ঝুলছে?

একটা চাকার অক্ষর উপর সে বসে আছে–সে দেখতে পেলে। চাকাটা থেকে আরো তিনটে ওরকম মই ঝুলছে টিলার উপরে যে হাওয়াক বানানো হয়, তারই চারটে পাখনা নিশ্চয়ই। ভাগ্যিশ! না-হলে ওই পাখনা বেয়ে যখন সে উঠেছিলো, তখন ঐ হাওয়াকল

চললেই হয়েছিলো আর কী–তাকে শুষ্টু বনবন করে ঘুরতে শুরু করে দিতে, নাগরদোলার মতো!

হাওয়া এলে সকালবেলাতেই এটা হয়তো ঘুরপাক খেতে থাকবে–এই সম্ভাবনাটা কিছুতেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। আর, তখন, এর ঘুরতে-থাকা অক্ষর উপর বসে-থাকা তার পক্ষে বিষম কঠিন হয়ে উঠবে। তাছাড়া কলওলা যখন পাখনা ছড়িয়ে কল চালিয়ে দিতে আসবে, তখন তাকে দেখতে পাবে বসে আছে এই অক্ষদণ্ডে। কিন্তু নিচে নামবে সে কোন্ সাহসে? নেকড়েগুলো এখনো নিচে ঘুরছে, লাফাচ্ছে আর গরজাচ্ছে–হয়তো তাদের হন্যে ডাক শুনে আশপাশের বাড়িঘরের লোকেরাই ঘুম ভেঙে ছুটে আসবে!

এখন তাহলে একটা কাজই সে করতে পারে। ঐ মিল-এর মধ্যেই ঢুকে পড়া তার পক্ষে সমীচীন; সেখানে সারাদিন কাটাতে হবে লুকিয়ে–অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে কলওলা এখানে থাকে কিনা তার উপর; দেখে-শুনে মনে হচ্ছে কলওলা সম্ভবত এখানে থাকে না; সেক্ষেত্রে সারাদিন এখানে গা-ঢাকা দিয়ে থেকে রাত্তিরে আবার রওনা হয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এই ভেবে সে অতি সাবধানে ছাদের দিকে চলে গেলো-তারপর গিয়ে পৌঁছলো জানলার কাছে। জানলা খুঁড়েই উঠেছে পিছনের লম্বা খুঁটিটা, একেবারে মাটিতেই পোঁতা বোধহয়।

ওই তল্লাটে এ-রকম হাওয়াকল অনেক আছে। বাঁকানো একটা কীলকের টুপি পরানো হাওয়াকল, দেখে মনে হয় যেন একটা শিরস্ত্রাণ। এই ছাদটা ঘর্ষণ-ঘোরকের উপর ভর দিয়ে চলে, আর চাকাগুলো হাওয়ার তোড়ে পাক খায়। এই কাঠের বাড়ির প্রধান অংশটা

কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় হাওয়ালের উপর বসানো নয়, মাটির সঙ্গেই আটকানো–পরস্পরের মুখোমুখি দুটি দরজা আছে তাই দিয়েই সেখানে পৌঁছনো যায়।

জানলার কাছে পৌঁছেই ফেরারি সেই সরু ফোকরটা দিয়ে সহজেই কোনো শব্দ না করে নেমে এলো। ফোকরটা দিয়ে এসে পৌঁছনো যায় হাওয়ালের মতো এক জায়গায়, হাওয়ালের চাকা দিয়ে সেটা আড়াল করা। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার, স্তব্ধতাও যেন তেমনি নিরেট। অন্তত এখন যে নিচে কেউ নেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা বন্ধুর সিঁড়ি নিচের তলা অব্দি নেমে গেছে–মেঝেটা নোংরায় ভর্তি।

কিন্তু চিলেকোঠা ছেড়ে নিচে নেমে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রথমে চাই কিছু খাদ্য, ওদিকে এতক্ষণে ঘুমেও দু-চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে : ক্ষুধা আর ঘুমকে সে এখন ঠেকাবে কী করে? এদিকে শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়েই সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিলো, ভেবেছিলো পরে কোথাও গিয়ে কিছু খাবার জোগাড় করে নেবে। কিন্তু কোত্থেকে সে খাবার জোটাবে এখন–আর কেমন করেই বা জোটাবে? মাথা ঠাণ্ডা করে এখন সে-বিষয়টা ভেবে নেয়া উচিত।

সাড়ে-সাতটায় যখন কুয়াশা সরে গেলো, হাওয়াকলের আশপাশটা ভালো করে নজরে পড়লো; হাওয়াকলের ডানদিকেই রয়েছে মস্ত সমভূমি, মাঝে মাঝে বরফের স্তূপ, আর তারই পাশ দিয়ে গেছে এক অন্তহীন পথ, পশ্চিমদিকে, গাছপালার তলা দিয়ে, একটা জলাভূমির পাশে মোচড় মেরে। বাঁদিকে ছড়িয়ে আছে হ্রদ, সেখানটায় এমবাখ নদী এসে মিশেছে, সেই মোহনার কাছটা ছাড়া হ্রদটা এখনো তুষারধবল ও নিরেট পড়ে আছে। মাঝে মাঝে ইতস্তত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদারু, তাদের ডালপালা কালো পাতার

ঝাড় যেন পাতাঝরা কঙ্কালসার মেপল আর এলডার গাছগুলোরই প্রতিতুলনা। সে আরো তাকিয়ে দেখলে যে নেকড়েদেরও আর-কোনো পাত্তা নেই কিছুক্ষণ ধরে সত্যিই অবশ্য তাদের গর্জন আর কানে আসছিলো না।

ভালোই হলো, ভাবলে সে মনে মনে, কিন্তু কাস্টমসের লোক আর পুলিশ হলো ঐ নেকড়েগুলোর চেয়েও ভয়ানক!...উপকূলের যত কাছে গিয়ে পৌঁছুবো, ততই তাদের চোখে ধুলো দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে... ঘুমে দু-চোখের পাতা একেবারে জড়িয়ে যাচ্ছে... ঘুমের ঘোরে পড়ে না যাই নিচে। কিন্তু নিচে নামবার আগে একবার চারপাশ ভালো করে দেখে নেয়া যাক–হঠাৎ কেউ এসে চড়াও হলে কোথায় পালাবো, সেটা অন্তত ঠিক করে রাখি।

বৃষ্টি ধরে গিয়েছে। হাওয়া বইছে পশ্চিমমুখো। তাপমাত্রাও একটু উঠে এসেছে। কিন্তু হাওয়ার জোর দেখে কলওলা এসে তার কলটা চালিয়ে দিতে চাইবে নাকি এখন?

জানলা দিয়ে তাকালে প্রায় আজ মাইল দূরে এলোমেলো ছড়ানো কতগুলো বাড়ি চোখে পড়ে। বাড়িগুলোর চালে শাদা তুষার জমে আছে, চিমনিগুলো দিয়ে উঠছে সকালবেলার আড়মোড়া-ভাঙা অলস ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কলওলা নিশ্চয়ই ওই বাড়িগুলোর একটাতেই থাকে।

মই বেয়ে সে প্রধান অংশটায় নেমে পড়লো। সার-সার পড়ে আছে। কতগুলো গমের বস্তা। কলটা তাহলে রোজই চালানো হয়–হাওয়া উঠলেই আজকে চালানো হবে: কল্লওলা

কি তাহলে শিগগিরই এসে হাজির হবে না–পাখাগুলোকে হাওয়ার মুখে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে?

তাহলে এই একতলায় থাকা আর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং চিলেকোঠাতে গিয়েই ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নেয়া যাক। আচমকা ধরা পড়ে যাবার ভয় অবিশ্যি রয়েইছে। মিলের দরজায় কেবল সাধারণ হুড়কো লাগানো; বৃষ্টি যদি আবার আসে, আশপাশের লোকেরা এসে আশ্রয় নেবে নির্ঘাত। ওদিকে হাওয়ার জোরও বেড়ে যাচ্ছে; কলওলা নিশ্চয়ই এক্ষুনি এসে উদিত হবে!

আবার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে উঠে পড়লো-ওঠবার আগে শেষবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো চারদিক। চিলেকোঠায় পৌঁছেই সে ধপ করে পড়ে গেলো লম্বালম্বি; অবসাদে সারা শরীর ভেঙে পড়ছে; শোবামাত্রই গভীর ঘুম।

জেগে যখন উঠলো, তখন ক-টা বাজে?–চারটে হবে বোধহয়; তখনও স্পষ্ট দিনের আলো আছে। অথচ আশ্চর্য, হাওয়াকল মোটেই চলছে না!

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে সে দেখলে যে তার হাতে-পায়ে কোনো সাড় নেই। নড়তেই পারলো না সে। আর নড়তে পারলো না বলেই এক মস্ত বিপদ থেকে বেঁচে গেলো।

নিচের তলায় কারা যেন কথা বলছে–বেশ উত্তেজিতভাবেই কথা বলছে লোকগুলো। তারা যে কখন এসে পৌঁছেছে, ঘুমের ঘোরে তা সে একেবারেই টের পায়নি। চিলেকোঠায় এসে তাকে দেখে গেছে নাকি!

নড়াচড়া না-করে নিঃসাড়ে সে পড়ে রইলো লম্বালম্বি–কেবল উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো নিচে কী বলাবলি হচ্ছে।

দু-একটা কথা শুনেই আগন্তুকদের পরিচয় সে জেনে ফেললে, আর তক্ষুনি বুঝতে পারলে যে কোনো ভীষণ বিপদের হাত থেকে সে এইমাত্র বেঁচে গেলো! বেঁচে অবিশ্যি ঠিক যায়নি; কলওলার সঙ্গে যে তিনটি লোক তর্কাতর্কি করছে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের আগে বা পরে চম্পট দিতে পারলেই সে বেঁচে যাবে।

লোক তিনটে আর কেউ নয়, পুলিশ: একজন সারজেন্ট, আর অন্য দুজন তার সহকারী।

+

সেই সময়ে বলটিক দেশগুলোর কর্মচারীদের রুশীকরণ মাত্র শুরু হয়েছে–আলেমানদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করে নিয়োগ করা হচ্ছে স্লাভদের। তখনও পুলিশের অনেক লোকই ছিল আসলে আলেমান, আর তাদের মধ্যে সারজেন্ট য়েক ছিলো সবচেয়ে নামজাদা। সারজেন্ট য়েক ছিলো খুবই একচোখা ও সাম্প্রদায়িক–লিভেনিয়ার রুশীরা কোনো দুষ্কর্ম করলে সে কিছুতেই ছেড়ে কথা কইতো না, কিন্তু সেই একই কুকর্মের জন্য আলেমানদের সে অনেক সময় মাফ করে দিতো।

এমনিতে ভারি কাজের লোক, গম্ভীর ও ভারিক্কি; ওপরওলারা তার উপরে ছিলো খুবই সন্তুষ্ট। একবার কোনো দুষ্কর্মের কথা তার কানে এলেই হলো, একেবারে নাছোড়বান্দার মতো তার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সে লেগে থাকতো। সব কাজেই তার সাফল্য ছিলো অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী–কোনো মামলা-মোকদ্দমাতেই একবারও পরাস্ত হয়নি বলে ভারি

অহংকার ছিলো তার। কোনো জরুরি তদন্ত হাতে এলে চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে; অবসাদ বলে কোনো কথা তার অভিধানে নেই, ভীষণ চালাকচতুর। লিভোনিয়ার এক স্লাভ সাইবেরিয়া থেকে পালিয়েছে, তাকে পাকড়াতে হবে–এ-কথা শুনেই সে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে।

ফেরারি যখন ঘুমিয়েছিলো, কলওলা তখনই এসে পৌঁছেছিলো তার মিলে। নটা নাগাদ হাওয়ার গতি ছিলো বেশ প্রসন্ন; তখন যদি সে কলটা চালিয়ে দিতো, তাহলে হাওয়ালের পাখার কাঁচকোঁচ শব্দে ফেরারির ঘুম ভেঙে যেতো নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকে, তক্ষুনি হাওয়া পড়ে যায়, কাজেই কলওলা অলসভাবে দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের কাছেই। এমন সময়েই সারজেন্ট য়েক সদলবলে এসে হাজির-কলওলাকে নিয়েই য়েক তার মিলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

দ্যাখোনি তুমি লোকটাকে? জেরা করছিলো য়েক, বয়েস হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ–হ্রদের ঠিক মুখটায় তাকে দেখা গিয়েছিলো!

কই, কাউকেই তো দেখিনি, কলওলা বললে, এই ঠাণ্ডায় দিনে দুটি লোকও গ্রামে এসে হাজির হয় কি না সন্দেহ।... লোকটা কি বিদেশী?

বিদেশী?...না, রুশী...বলটিক এলাকার রুশী। বদমায়েশের ধাড়ি! লোকটাকে গ্রেফতার করতে পারলে বেশ নামজাদা হয়ে যাবো।

পুলিশের লোকের কাছে ফেরারি মাত্রেই বদমায়েশের ধাড়ি–তা সে রাজনৈতিক বন্দীই হোক, কি খুনে বাঁটপাড়ই হোক!

আপনি তার পিছু নিয়েছেন? খুঁজছেন তাকে? কলওলা জিগেশ করলে।

চব্বিশ ঘণ্টা আগে তাকে একবার সীমান্তের কাছে দেখা গিয়েছিলো।

কোথায় যাচ্ছিলো সে? কেউ জানে সেইকথা? কলওলা বেশ অনুসন্ধিৎসু মানুষ।

অনুমান করা যায়, য়েক তাকে বললে, বরফ গলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই জাহাজে ওঠা যায় এমন জায়গায় যেতে চাচ্ছে নিশ্চয়ই–রিগার বদলে রেফেল-এর দিকেই যাচ্ছে নিশ্চয়ই লোকটা।

সারজেন্ট য়েখ ভুল করেনি। কারণ রেফেল বেশ বড়োশড়ো ব্যাবসার কেন্দ্র, আর বন্দরও আছে। কিন্তু হাওয়াকল থেকে রেফেল-এর দূরত্ব অন্তত আশি মাইলসেখানে পৌঁছুতে হলে কম করে চারটে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।

রেফেল কেন?...পেরনাউ গেলেই তো তার সুবিধে হবে,বললে কলওলা।

পেরনাউ সত্যিই অপেক্ষাকৃত কাছে-ষাট মাইল দূরে। কিন্তু রিগা, সে প্রায় ডবল দূরে... কাজেই রিগার রাস্তায় অতটা কড়া তল্লাশি হবে না নিশ্চয়ই।

বলাই বাহুল্য, ফেরারি তখন চিলেকোঠার মেঝেয় দম বন্ধ করে শুয়ে উৎকর্ণভাবে প্রতিটি কথা শোনবার চেষ্টা করছে। সব কথা ঠিকমতো শুনতে পেলে তার সুবিধেই হবে শেষকালে।

হ্যাঁ, সারজেন্ট বললে, পেরনাউ-এর কথা অবিশ্যি মনে রাখতে হবে। ফাললেন-এর ঘাঁটিগুলোয় খবর দেয়া হয়েছে, যাতে পেরনাউ-এর রাস্তায় কড়া নজর রাখে। কিন্তু সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে লোকটা সম্ভবত রেফেলই যেতে চাচ্ছে–রেফেল-এ তার পক্ষে জাহাজে ওঠা অনেক সহজ হবে।

এটা আসলে মেজর ফেরডের-এর অনুমান। কর্ণেল রাগেনোফ-এর ডান। হাত এই মেজর ফেরডের-লিভোনিয়ার পুলিশের বড়ো কর্তা। তিনিই য়েককে রেফেল-এর রাস্তায় কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্নেল রাগেনোফ নিজে স্লভ আর মেজর ফেরডের হলেন আলেমান–কাজেই দুজনের দ্বেষ ও ভালোবাসা, সহানুভূতি ও অনীহা সমান নয়। কিন্তু সারজেন্ট মেক-এর মনোভাব বেশ ভালো করেই জানেন মেজর ফেরডের। এটা ঠিক যে তার এত কড়াক্কড়কে মোলায়েম করবার জন্য আছেন জেনারেল গোরকো-বালটিক দেশগুলোর রাজ্যপাল, বেশ উঁচুতলার মানুষ- তিনিই প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় রুশীদের চাকরি দেবার পক্ষপাতী।

আরও কয়েক মিনিট চললো কথাবার্তা। পুলিশের কাছে যে বিজ্ঞপ্তি পৌঁছেছিল, সেই অনুযায়ী-ফেরারির চেহারার একটা বর্ণনা দিলে সারজেন্ট য়েক : প্রমাণ মাপের চেয়ে একটু লম্বা লোকটা, বেশ সবল গড়ন, বয়েস পঁয়ত্রিশ, ঘন দাড়ি মুখে-লালচে রঙের, গায়ে একটা বাদামি রঙের কাফতান–অন্তত সীমান্ত পেরুবার সময় এই তার পরনে ছিলো।

আচ্ছা, আবার বলুন তো, কলওলা জিগেশ করলে, লোকটা...রুশী, তাই তো বললেন আপনি?

হ্যাঁ, রুশী।

হুম! না, আমাদের গ্রামে তাকে কোথাও দেখা যায়নি–কোনো বাড়িতেই তার কোনো হদিশ পাবেন না!

জানো তো, সারজেন্ট তাকে মনে করিয়ে দিলে, যে তাকে আশ্রয় দেবে, তারও গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা আছে–তাকে ঐ ফেরারির শাগরেদ বলেই গণ্য করা হবে।

ভগবান রক্ষে করুন! আমি বাপু ও সব ঝক্কিঝামেলায় নেই!

ঠিকই ভেবেছো তুমি, য়েক যোগ করলে, মেজর ফেরডের-এর সঙ্গে ঝগড়া বাধালে ফল খুব একটা ভালো হয় না।

নিশ্চয়ই। মেজর ফেরডের যাতে আমার উপর চটে না-যান, সেদিকে লক্ষ রাখবো বৈকি!

য়েক বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হলো। পেরনাউ থেকে রেফেল–এক টুকরো জমিও সে বাদ দেবে না, সব তন্নতন্ন করে খুঁজবে;–যাবার আগে আবার সে শাসিয়ে গেলো, সব জায়গার পুলিশকেই খবর জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সবাই সারাক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

আমরা কথা বলছি, এই ফাঁকে হাওয়ার জোর দেখছি আবার বেড়ে উঠলো–বেশ জোরে বইতে শুরু করে দিয়েছে হাওয়া, কলওলা বললে, আপনার লোকদের বলবেন একটু সাহায্য করতে? পাল খাটাববা... তাহলে আর আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয় না–সারা রাতটাই এখানে কাটিয়ে দিতে পারি। বলবেন ওদের একটু হাত লাগাতে?

দ্বিরুক্তি না-করেই সাগ্রহে রাজি হলো য়েক। উলটো দিকের দরজা দিয়ে তার অনুচর দুজন বেরিয়ে গেলো, তারপর হাওয়ালের চাকাগুলো ঘুরিয়ে হাওয়ার মুখে এনে হাজির করে দিলো। পালে হাওয়া লাগলো, শুরু হলো চাকার শব্দ : ক্যাঁচ-কোচ, ক্যাঁচ-কোঁচ! তারপরেই সারজেন্ট য়েক সদলবলে উত্তর-পশ্চিমমুখো রওনা হয়ে পড়লো।

+

সব কথাই সে যেন গোগ্রাসে গিলছিলো। যতটুকু শোনা গেলো, তাতেই বোঝা গেলো, বুঝি তীরে এসে তরী ডোবে-তার যাত্রার শেষটায় মস্ত বিপদ ওঁৎ পেতে আছে! সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তার পালাবার খবর। পুলিশ চারপাশ একেবারে চষে ফেলছে...বিভিন্ন পুলিশের ঘাঁটি একই কাজের জন্য হাত মিলিয়েছে...রেফেল যাবার চেষ্টা করা কি ঠিক হবে তার? না, তক্ষুনি সে মনস্থির করে ফেললো। বরং পেরনাই যাওয়াই ভালো–অন্তত তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছুতে পারবে। তাপমাত্রা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে বরফ গলা শুরু হয়ে গেলো বলে।

যেমনি ভাবা অমনি কাজ : অন্ধকার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে মিল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে যাতে কওলার চোখে না পড়ে। পাখাগুলো দিব্যি ঘুরছে, রাত্রে সম্ভবত আর হাওয়া পড়ে যাবে না, লোকটা তো রাতের নাম করেই আশ্রয় নিয়েছে এখানে। নিচের তলায় নেমে গিয়ে সোজাসুজি দরজা খুলে বেরুবার কথা ভাবাই চলে না আর–আবার ওই ফোকরটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুবে না কি? খুঁটি বেয়ে নেমে যাবে তারপরে মাটিতে?

যদিও পাখনার অক্ষদণ্ডটা এখন পাক খাচ্ছে আর চাকার দাঁতে জড়িয়ে যাবার ভয়ও রয়েছে, তবু কোনো শক্তসমর্থ ক্ষিপ্র লোকের পক্ষে ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। একবার বেশামাল হলেই একেবারে পিষে যাবে–কিন্তু ঝুঁকিটা তো তাকে নিতেই হবে।

অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। যদি তার আগে কোনো কাজে কলওলা চিলেকোঠায় এসে হাজির হয়, তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে... তাকে দেখে ফেললেই সর্বনাশ! যদি দিনের আলো থাকে, তাহলে দেখে তো ফেলবেই! আর যদি রাতই হয়, তখন তার হাতে তো মশাল বা লণ্ঠন একটা-কিছু থাকবেই!

হুম! কলওলা এসে যদি তাকে চিলেকোঠায় লুকিয়ে থাকতে দ্যাখে, তাহলে সোজা সে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, একদম পেড়ে ফেলবে তাকে, বেঁধে রেখে দেবে। কলওলা যদি বাধা দিতে চায়, যদি আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা করে, যদি চেল্লাচিল্লি করে চারপাশে শোর তুলে দেয়, তাহলে আর দেখতে হবে না, তার ছুরিটা তার সব চ্যাঁচামেচিকে স্তব্ধ করে দেবে। এত বিপদ পেরিয়ে, এত ঝুঁকি সামলে সে এত দূরে আবার গ্রেফতার হতে আসেনি–মুক্তির জন্য সে সবকিছু করতে পারে–এমনকী খুন করতেও কোনো দ্বিধা করবে না।

কিন্তু তবু–তবু হয়তো এখনো রক্তপাতের কোনো প্রয়োজনই হবে না, হয়তো এখনো ও রকম চূড়ান্ত কিছু করবার দরকার হবে না তার... আর তাছাড়া ওই কলওলা খামকা এখন এই চিলেকোঠাতেই বা হানা দেবে কেন?...তার তো এখন হাওয়াকলের তদারকি করার কথা, পাখা ঘুরছে বন-বন, তার সঙ্গে সঙ্গে গম-পেষাইয়ের জাঁতাগুলো কেমন ঘুরছে, সেদিকেই তো সে নজর রাখবে এখন।

অক্ষদণ্ডর শব্দ হচ্ছে ক্যাঁচ-কোঁচ, পাখা ঘুরে যাচ্ছে একটানা, চাকার শব্দ, বাতাসের শোঁ-শোঁ, গম-পেষার শব্দ, জাতা ঘুরছে; আর এরই মধ্যে কেটে গেলো এক ঘণ্টা সময়। এ-রকম উঁচু অক্ষরেখায় সন্ধ্যা থাকে অনেকক্ষণ। আস্তে-আস্তে ছায়া করে এলো চারপাশে। চিলেকোঠার ভিতরটায় অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে। এবার তাকে ধীরেসুস্থে রওনা দিতে হবে। রাতে ভারি কষ্ট হবে যেতে–আরো চব্বিশ মাইল না-গেলে কোনো আশ্রয়ই মিলবে না; আর দেরি করা উচিত নয় তার, সম্ভব হলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া উচিত।

খাপের মধ্যে ছুরিটা সহজে ও মসৃণভাবে নড়াচড়া করে কি না, সেটা সে একবার দেখে নিলে; রিভলবারে পুরে নিলে ছটা গুলি।

এবার সেই মস্ত ঝক্কিটা; সরু ফোকরের মধ্যে শরীরটা গলিয়ে দিতে হবে এবার, লক্ষ রাখতে হবে সেই ঘূর্ণমান অক্ষদণ্ড যাতে ছুঁয়ে না-ফ্যালে। একবার যদি অক্ষদণ্ডটা না ছুঁয়েই ফোকরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, তাহলে নিচে নামতে আর কতক্ষণই বা!

নিঃশব্দে ধীরে-সুস্থে সে যেই ফোকরের দিকে এগোবে, এমন সময় হাওয়াকলের কাঁচ কোচ ছাপিয়ে আরেকটা আওয়াজ তার কানে এলো। ভারি জুতোর মশমশে আওয়াজ, কাঠের সিঁড়ির উপরে জুতোর শব্দ। লণ্ঠন হাতে কলওলা শেষকালে চিলেকোঠাতেই উঠে আসছে।

কলওলা যখন দেখা দিলে, ফেরারি তখন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি– ধনুকের মধ্যে ছিলার মতো সে টান হয়ে আছে। কিন্তু চিলেকোঠার মেঝে বরাবর যখন কলাওলার শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখা গেলো, তখুনি কলওলা ফিসফিশ করে বললে, ছোটো বাবা*, এবার যাবার সময় হলো...আর দেরি কোরো না... নিচে নেমে এসো ...দরজা খোলাই আছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলো ফেরারি, কোনো কথাই হাড়ে পেলে না সে। তাহলে কলওলা জানতো যে সে এখানে আছে...তাকে এই চিলেকোঠায় আশ্রয় নিতে সে আগেই দেখেছিলো?... হ্যাঁ, যখন সে ঘুমিয়েছিলো, তখনই নিশ্চয়ই কলওলা চিলেকাঠায় এসে হাজির হয়েছিলো; তাকে ঘুমন্ত দেখে নিশ্চই আর জাগাবার চেষ্টা করেনি। কারণ সেও তো তারই মতো স্লাভ একজন।...একবার দেখেই একজন স্লাভ অন্য স্লাভকে চিনে নিতে পারে।... লিভোনিয়ার পুলিশ যে তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, এটা নিশ্চয়ই কলওলা বুঝতে পেরেছিলো।...কেন তাড়া করছে, তা সে জানতে চায়নি, কিন্তু তাই বলে সারজেন্ট য়েক আর তার দলবলের হাতেও তাকে তুলে দিতে চায়নি সে।

নেমে এসো নিচে, চাপা গলায় বললে কলওলা।

বুকের মধ্যে তার যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। আবেগে তার সারা গা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। চুপচাপ সে নেমে এলো নিচে। নিচের তলার একদিকের দরজা খোলা।

এই রইলো কিছু খাবার, তার থলির মধ্যে কিছু শুকনো মাংস আর রুটি ভরে দিলে কলওলা। থলিটায় কিছু নেই, আগেই দেখেছিলুম।...ফ্লাস্কটাও তো ফাঁকা...ওটাও ভরে নাও, তারপর কেটে পড়ো...

কিন্তু...পুলিশ যদি জানতে পারে...

চেষ্টা কোররা তাদের এড়িয়ে চলতে। আর আমার কথা? ও নিয়ে কিছু ভেবো না...আমি জানতেও চাই না তুমি কে...আমি শুধু জানি যে তুমি একজন স্লাভ, আর একজন স্লাভকে কি আরেকজন কখনো আলেমান পুলিশের হাতে তুলে দেয়!

ধন্যবাদ...ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতায় ফেরারির গলা বুজে এলো।

তাহলে তুমি এসো, ছোটো বাবা। ভগবানই যেন তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান...তিনিই তোমাকে ক্ষমা করবেন, অবিশ্যি যদি তুমি ক্ষমা চাওয়ার মতো কোনো অপকর্ম করে থাকো!

+

আবার অন্ধকারে ঢাকা রাত্রি। উঁচু ঢিবিটার তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে রাস্তা-ফাঁকা রাস্তা–কেউ কোথাও নেই। ফেরারি কলওলার দিকে পিছন ফিরে শেষবার হাত নেড়ে বিদায় নিলে, তারপর হনহন করে চলতে শুরু করে দিলে।

এই যে নতুন রাস্তাটা সে বেছে নিয়েছে, তাতে তাকে আজ রাত্তিরের মধ্যে ফাললেন পৌঁছুতে হবে; পৌঁছে সেখানে দিনটা কাটিয়ে দেবার মতো একটা গোপন ও নিরাপদ আশ্রয়ও খুঁজে বার করতে হবে। চব্বিশ মাইল... মনে মনে সে হিশেব করলে: চব্বিশ মাইল পেরুতে হবে তাকে আজ রাত্তিরে। তারপরে আর মাত্র ছত্রিশ মাইল বাকি থাকবে পেরনাউ-এর। আরো দুটো রাত; যদি দুমকরে হঠাৎ সব পরিকল্পনা ভেস্তে না যায়, তাহলে ১১ই এপ্রিল মাঝরাত্তির নাগাদ গিয়ে পৌঁছুতে পারবে পেরনাউ-এ। সেখানে তারপর লুকিয়ে থাকতে হবে তাকে যতদিন না কোনো জাহাজে গিয়ে ওঠবার সুযোগ আসে, ততদিন তাকে সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। বরফ গলে গেলেই অবিশ্যি বলটিকের জলে একের পর এক জাহাজ ছাড়বে–তার যে কোনো একটায় জায়গা সে পাবেই।

হনহন করে এগুচ্ছে সে, এইভাবে এগুতে পারলে ভাবনা নেই। এই পথে পড়ছে ফাঁকা সমভূমি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আবার হঠাৎ কালো বনের ছায়ায় পথ গেছে এঁকেবেঁকে। কখনো-বা ছোটো টিলার তলা দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে, সাবধানে কাটাতে হচ্ছে সংকীর্ণ একেকটা খাদ, কখনো বা পেরিয়ে যাচ্ছে। গ্র্যানাইট পাথরের ধার ঘেঁষে বয়ে চলা জমাট নদী, গাছপালার তলায় নদীর স্রোতকে কে যেন তিষ্ঠ বলে আঙুল তুলে থামিয়ে দিয়েছে, ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিয়েছে। লেক পেইপুসের কাছে, পায়ের তলার বরফ ছিলো নিরেট, শুকনো, জমাট বাঁধা–এখানে মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে–বরফ গলা শুরু হয়েছে বলে।

মাঝে মাঝে, অনেকক্ষণ পরে-পরে, দেখা দিচ্ছে ঘুমন্ত গ্রাম, আশপাশের বরফ-ঢাকা মাঠ।

তাপমাত্রা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। আদ্ধেক-গলা বরফ প্রায় যেন কাদাজল হয়ে গেছে। এ-বছর বরফ গলবে খুব তাড়াতাড়ি।

ফাললেন-এ পৌঁছুবার আগেই, ভোর রাতে, পাঁচটা নাগাদ ফেরারি এসে পৌঁছলো একটা ফাঁকা ও পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপের ধারে। এখানেই তো সে লুকিয়ে থাকতে পারে। কলওলা যে রুটি-মাংস দিয়েছিলো তাতেই দিব্যি চাঙ্গা হয়ে নেয়া যাবে–একটু ঘুমিয়ে নিলে তো কথাই নেই, বেশ ঝরঝরে ও হালকা লাগবে।

সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালো সে, গভীর ক্লান্তিহরণ ঘুম। তারপর সন্ধে ছটা নাগাদ আবার সে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। পেরনাউ আরো ছত্রিশ মাইল। দূরে–আজ ৯ই এপ্রিল রাত্তিরে যদি আদ্ধেকটা পথ পেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে আর মাত্র একটা রাত লাগবে–তার পরেই...

তাই হলো। সকালবেলায় তাকে থামতে হলো আবার, কিন্তু এবার তেমন সুবিধের কিছু পেলো না বলেই আশ্রয় নিতে হলো রাস্তার ধারের পাইন গাছের বনে। কোনো সরাইখানা বা খামারবাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম ও খাদ্য চাইবার চেয়ে এটা অনেক ভালো–অনেক ঝক্কি কম। ওই কলওলার মতো সদয় গৃহস্বামী তো আর সুলভ নয় সবখানে।

বিকেলবেলায় সে বসে আছে ঝোঁপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে, হঠাৎ দেখতে পেলে একদল পুলিশ পেরনাউ-এর রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাইন বনের কাছে এসে পুলিশবাহিনী

একটু থমকে দাঁড়ালে–আস্ত পাইন বনটাই তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে কিনা, হয়তো সেই কথাই ভাবলে একবার। কিন্তু তারপর, একটু বিশ্রাম করে, তারা আবার রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলো।

সন্ধেবেলায় ছটা নাগাদ ফেরারি আবার রাস্তায় নেমে পড়লো। নির্মেঘ আকাশ, ভরা চাঁদ উঠেছে আকাশে, হাসছে যেন তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি। রাত তিনটে নাগাদ পেরনোভ নদীর বাম তীরে এসে পৌঁছুলো সে–পেরনাউ আরো তিন মাইল উজানে। এগুতে গিয়েই এসে পৌঁছুলো শহরতলিতে। ছোটখাটো একটা সরাইখানায় গিয়ে দিন কাটালে কেমন হয়, সে ভাবলে একবার।

পেরনোভা নদীর বরফ গলে যাচ্ছে, বড়ো-বড়ো বরফের চাঙড় স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে উপসাগরের দিকে-দেখে তার ভারি ভালো লাগলো। আর কয়েকটা দিন কেবল, তার পরেই শেষ হবে তার এই অন্তহীন কুচকাওয়াজ, এই লম্বা পথ হাঁটা, তার পরেই শেষ হবে সব বিপদ-আপদ, সব অবসাদ।

অন্তত এই কথাই সে ভেবেছিলো।

হঠাৎ উঠেছিলো চিৎকারটা। ঠিক লেক পেইপুসের ধারে সে যে সম্ভাষণ শুনেছিলো ঠিক তেমনি একটা মুচমুচে টিউটনিক চিৎকার হ্বের ডা? হুকুমদার! কিন্তু এবার সম্ভাষণটা কোনো কাস্টমসের লোকের মুখ থেকে বেরোয়নি।

একদল পুলিশ নিয়ে যেন মাটি খুঁড়ে এসে হাজির হয়েছে সারজেন্ট য়েক, এই রাস্তায় তারা টহল দিচ্ছিলো।

ফেরারি কেবল থমকে দাঁড়িয়েছিলো এক মুহূর্ত, তারপরেই লাফিয়ে নেমে গেলো টিলা থেকে।

ঐ যে—ঐ লোকটা, চেঁচিয়ে বললে একজন।

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো সব-চোখের আড়ালে যাবে কী করে এই চাঁদের আলোয়! য়েক আর তার শাগরেদরা তাড়া করে ধেয়ে এলো পিছন-পিছন। কিন্তু এখন, এতদিন পরে, অবসাদে তার হাঁটুর জোড় যেন খুলে যেতে চাচ্ছে—কিছুতেই সে জোরে ছুটতে পারছিলো না। এই পুলিশদের হাত থেকে ছুটে সে পালাবে কী করে? তারা তো আর তার মতো রাতের পর রাত মাইলের পর মাইল পথ হাঁটেনি।

মরবো, কিন্তু ধরা দেবো না—কিছুতেই না! সে ঠিক করে ফেললে।

নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলো একটা মস্ত বরফের চাঁই—তীর থেকে পাঁচ-ছ গজ দিয়ে। মস্ত লাফ দিলে সে, প্রকাণ্ড; লাফিয়ে গিয়ে পড়লো সে তার উপর!

গুলি চালাও! গুলি! য়েক চেঁচিয়ে উঠলো।

গুড়ুম! গুড়ুম? গর্জে উঠলো চারটে রিভলবার-ভাঙন-ধরা বরফের উপর গিয়ে পড়লো গুলিগুলো।

ফেরারি গিয়ে উপরে পড়তেই বরফের মস্ত চাঙড়টা জলের উপর এক পাক ঘুরে গেলো, তার পরেই স্রোতে ভেসে চলে গেলো দূরে। বরফ গলার সময় পেরনোভার জলে স্রোত থাকে দারুণ।

য়েক আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নদীর তীর ধরে তাড়া করে এলো— বেশ অসুবিধেই হচ্ছিলো ছুটতে, চলন্ত বরফের চাঙড় লক্ষ করে ঠিকমত তাগ করাও যাচ্ছিলো না। বরং যাকে তারা ধাওয়া করছে তারই মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে বরফের চাঙড়গুলোর উপর দিয়ে যেতে পারতো তারা।

চেষ্টা করতে তারা ছাড়লে। য়েক লাফিয়ে এলো সব আগে, পিছন-পিছন অন্যরা। হঠাৎ এমন সময় দারুণ একটা হুলুস্থুল উঠলো। নদী যেখানে সরু হয়ে গিয়ে ডানদিকে বাঁক ফিরেছে, সেখানে কয়েকটা ভাসমান বরফের চাঙড়ের সঙ্গে ফেরারিসমেত বরফের চাঙড়টার লাগলো এক বিষম ধাক্কা। চাঙড়টা তক্ষুনি এ-কাৎ হলো, ও-কাৎ হলো, পাক খেলা, আবার চাপা পড়ে মিলিয়ে গেলো। নদীর সরু বাঁকে অনেকগুলো মস্ত বরফের চাঙড় এসে আটকে পড়ে বাঁধের সৃষ্টি করেছিলো।

বরফের চাঙড়টা আটকে যেতেই পুলিশেরা এদিক-ওদিক দিয়ে ছুটে এলো। এক ঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে তাকে খুঁজলো তারা। কেউ কোথাও নেই—শুধু শাদা তুষারমরু পড়ে আছে খাঁ খাঁ। ধাক্কা লেগে বরফের চাঙড়টা যখন উলটে পড়েছিলো, তখনই নিশ্চয়ই সে মারা গেছে।

জ্যান্ত ধরতে পারলে হতো লোকটাকে... প্যানপ্যান করলে একটি পুলিশ।

জ্যান্ত ধরতে পরলে তো হতোই, বললে সারজেন্ট য়েক, কিন্তু জ্যান্ত যখন তাকে পাকড়ানো গেলো না, তখন মৃতদেহটা পেলেও চলবে—তারই চেষ্টা করতে হবে আমাদের।

———

* ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার সাধারণ লোকেরা সাধারণতঃ পরস্পরকে ছোটো বাবা বলেই সম্বোধন করতে, আর স্ত্রীলোক হলে বলতো ছোটো মা।

নিকোলেফ পরিবার

৩. নিকোলেফ পরিবার

পরের দিন ১২ই এপ্রিল। বসে কথা বলছিলো তিনজনে-অনেকক্ষণ ধরে তারা বসে আছে আরেকজনের অপেক্ষায়। রিগা শহরের একটা বাড়ির খাবার ঘর এটা; সন্ধে হয়ে গেছে–সাতটা থেকে আটটার মধ্যে হবে সময়। শহরের এদিকটায় সব বাড়িই রুশীদের। এ-বাড়িটা খুব-একটা অবস্থাপন্ন লোকের নয়; মধ্যবিত্তদের বাড়ির মতো, ইট-কাঠের তৈরি। এদিকটায় ইট-কাঠের বাড়ি খুব একটা নেই, বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের। দেয়ালের গা কেটে বসানো হয়েছে চুল্লি; সারাদিন ধরে চুল্লিটা জ্বলছে, ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ দিচ্ছে—বেশ গা-সওয়া গরম; বাইরে দেয়ালের গায়ে তাপমান যন্ত্রে অবিশ্যি হিমাঙ্কর একটু উপরে উঠেছে পারদ। মাঝখানের টেবিলে জ্বলছে একটা ছোট্ট প্যারাফিন লণ্ঠন। মারবেল-পাথর বসানো একটা খাবার-গাড়ির উপর টগবগ ফুটছে স্যামোভার; সাজানো পেয়ালা-পিরিচ দেখে বোঝা যায় চারজন লোকের চা খাবার কথা। কিন্তু চার-নম্বর ব্যক্তিটি তখনও এসে পৌঁছোয়নি, যদিও চল্লিশ মিনিট আগেই তার আসবার কথা ছিলো।

দিমিত্রি বড্ড দেরি করছে, অতিথিদের একজন মন্তব্য করলেন। ডবল জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, রাস্তা দেখতে লাগলেন। বয়েস তাঁর পঞ্চাশ, পেশা ডাক্তারি, নাম হামিনে–ও-বাড়ির অনেক দিনের বন্ধু। পঁচিশ বছর যাবৎ রিগায় তিনি ডাক্তারি করছেন, মস্ত পশার, নামডাকও যথেষ্ট। অন্য ডাক্তাররা ঈর্ষা করলেও অত্যন্ত দয়া আছে বলে লোকজনের মধ্যে তাঁর দারুণ খাতির। তবে পেশাগত ঈর্ষা যে কত নিচে

নামতে পারে, তা তো সব্বাই জানে—পৃথিবীর সবত্রই এই রকম। রুশদেশ তো আর সৃষ্টিছাড়া নয়।

দুই জানলার মাঝখানে দেয়ালে ঝুলছিলো এক পিতামহ-ঘড়ি। তার দিকে তাকিয়ে অতিথিদের আরেকজন বললেন, হ্যাঁ....আটটা প্রায় বাজে। কিন্তু মঁসিয় নিকোলেফের জন্য আরো সিকি ঘণ্টা অপেক্ষা করা যেতে পারে এবং ফরাশি দেশে আমরা বলি যে শেষ সিকি ঘণ্টা পনেরো মিনিটের চেয়েও অনেক লম্বা হয়। বক্তার নাম মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ–তিনি রিগার ফরাশি রাজদূত। বয়েস চল্লিশ, দশ বছর যাবৎ এই শহরে আছেন। হাবভাবে চলনে-বলনে আভিজাত্য, সহজে মেজাজ খারাপ করেন না, স্বভাবটা শান্ত।

বাবা পড়াতে গেছেন শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে, তৃতীয়জন ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলো, বড় দূর যেতে হয় তাঁকে, তাছাড়া এই দুর্যোগে যাতায়াত করাটাও খুব একটা সহজ নয়,–এই আদ্ধেক ঝড় আর আদ্ধেক বরফগলা...ফিরে যখন আসবেন, হাতে-পায়ে আর কোনো সাড় থাকবে না!

হুম! ডাক্তার হামিনে বললেন, চুল্লিটা তো দেখছি আদালতের জজ-সাহেবের মতো নাক ডাকাচ্ছে!... ঘরের ভিতরটায় বেশ গরম আছে, তার উপর স্যামোভারটাও চুল্লির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে...কয়েক পেয়ালা চা গলায় ঢাললেই দিমিত্রির গা গরম হয়ে যাবে.... কিছু ভেবো না, ইলকা।... আর তাছাড়া তার জন্য যদি ডাক্তার ডাকতে হয়, তাহলেও ঘরের বাইরে যেতে হবে না—আর ডাক্তারও তার অনেক দিনের বন্ধু!

আমরা তা জানি, ডাক্তার! মেয়েটি হেসে ফেললো।

ইলকা নিকোলেফ-এর বয়েস চব্বিশ–পুরোদস্তুর স্লাভ দেখতে। রিগার আলেমান মেয়েদের চেয়ে একেবারে আলাদা রকম দেখতে–তাদের গায়ের রঙ বড় লালচে, চোখগুলোও বড্ড বেশি নীল, চোখে কোনো ভাষা নেই, ধরনধারণ বড্ড টিউটনিক। ইলকার চুল আর চোখের তারা কুচকুচে কালোগায়ের রঙ বেশি ময়লা নয়, কেমন যেন একটা উষ্ণতা মাখানো, সোজা দাঁড়ায়, মুখচোখ সব যেন কেটে বসানো, চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে কেমন একধরনের গাম্ভীর্য, কিন্তু সেই কঠোর গাম্ভীর্য মোলায়েম হয়ে যায়, যখন সে কারু দিকে তাকায়—চোখের তারার আড়ালে যেন কোনো অন্তহীন বিষাদ লুকোনো। গম্ভীর ধরনের ভাবুক মেয়ে, ছলাকলা বা চতুরালি নেই স্বভাবে বা পোশাকে, শাদাশিধে সাজে, কিন্তু রুচির ছাপ স্পষ্ট, অর্থাৎ রুশী রক্তওলা লিভেনিয়ার তরুণীর এক নির্ভেজাল প্রতিভূ সে।

দিমিত্রি নিকোলেফ-এর স্ত্রী মারা গেছেন দশ বছর হলো। ইলকাই কিন্তু তাঁর একমাত্র সন্তান নয়। ইলকার ভাই জাঁ আঠারোতে পড়বে শিগগিরই; ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ ক্লাসে পড়ে। ছেলেবেলায় ইলকাই ছিলো জাঁ-এর মায়ের মতো–ও-রকমভাবে আর-কেউ তাকে ভালোবাসতে বা আদর করতেই পারতো না। ইলকা যেভাবে সংসার চালায়, তাকে প্রায় বলা যায় অলৌকিক। না-হলে অত কম টাকায় সংসার চালিয়ে কিছুতেই জাঁ-কে হয়তো ও-রকম খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে পড়ানো যেতো না।

দিমিত্রি নিকোলেফ-এর আয় কেবল ছাত্র পড়িয়ে। গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তিনি, নিজের বিষয় তাঁর নখদর্পণে; বাপের টাকা ছিলো না, কাজেই পড়িয়ে ক-পয়সাই। বা পান! অধ্যাপনার মজুরি সব দেশেই খুব কম, রুশদেশে তো আরো। লোকের শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমকে যদি টাকার অঙ্কে হিশেব করা যেতো তো দিমিত্রিকে বলা যেতো ক্রোড়পতি,

রিগার ধনকুবেরদের একজনস্লাভদের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্যই বুঝি-বা হয়ে পড়তেন রিগায়। মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ আর ডাক্তার হামিনের কথাবার্তা থেকে সেটাই অনুমান হচ্ছিলো। কথাবার্তা। হচ্ছিলো রুশ ভাষায় শিক্ষিত রুশীরা অবিশ্যি ফরাশিতেই কথা বলে, কিন্তু দ্যলাপোর্ৎ চোস্ত রুশ বলেন, শিক্ষিত রুশীর কেতাদুরস্ত ফরাশির চেয়েও রুশ ভাষায় তিনি বেশি শড়্গড়্।

আচ্ছা ডাক্তার, মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ বলছিলেন, আন্দোলন শুরু হলে বলটিক দেশগুলোর রাজনৈতিক অবস্থাই পালটে যাবে-আর ঠিক আন্দোলনের আগের মুহূর্তে আমরা কথা বলছি... দেখছেন তো এস্তোনিয়ার খবর-কাগজগুলো কেমন জমকালো আর্য ভাষায় গুজব রটাচ্ছে!

আস্তে-আস্তে সব হবে, ডাক্তার ঘোষণা করলেন, বিপ্লব নয়, বিবর্তন। তবে এই আলোমানদের হাত থেকে শিগগিরই শাসন-ব্যবস্থা ও পৌরসভা মুক্তি পেয়ে যারে-সে-দিনের আর দেরি নেই। এই যে আমাদের দেশের উপর ওদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছেকি একটা অদ্ভুত জরদগব ব্যবস্থা নয়?

দুর্ভাগ্যবশত, ইলকা বললে, যখন তাদের হাতে শাসনভার থাকবে না, তখনও তারা সর্বশক্তিমানই থাকবে–কারণ ওদের হাতে অঢেল টাকাকড়ি আছে। তারাই তো জমির মালিক—আর বড়ো-বড়ো চাকরি খালি হলে তো তারাই পায়।

বড়ো-বড়ো চাকরিগুলো, দ্যলাপোর্ৎ বোঝালেন, না-হয় তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া যাবে। কিন্তু জমিজমার ব্যাপারে ভারি মুশকিল হবে—যদি-বা একান্তই অসম্ভব না হয়,

সে-সম্বন্ধে কিছু করা যে অত্যন্ত কঠিন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।...এক লিভোনিয়াতেই তো আলেমানদের হাতেই বেশির ভাগ জমি।

অকাট্য তথ্য। বলটিক দেশগুলোর অভিজাত, প্রভাবশালী, নিদেন মধ্যবিত্ত কি ব্যাবসাদার সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই প্রায় টিউটনিক। এটা ঠিক যে এই আলেমানদের হাতে পড়ে অন্যরা কেউ-বা হয়েছে ক্যাথলিক, কেউবা হয়েছে প্রটেস্টান্ট, কিন্তু তবু কেউই একেবার পুরোদস্তুর জর্মান হয়ে যায়নি। ফিনদেরই গোত্রের লোক এই এস্তোনীয়রা—বেশির ভাগ লোকেই চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু রেফেল, ডোরপাট, এমনকী সেন্ট পিটার্সবুর্গে পর্যন্ত অনেকগুলো খবরের কাগজ এস্তোনীয়দের দাবি ও অধিকার বজায় রাখবার জন্যে শোরগোল তুলেছে–কোথাও কেউ তাদের বৈদেশিক প্রভুদের উপরকার রাগ ও অনীহা চেপে রাখবার চেষ্টা করছে না।

দ্যলাপোর্ৎ আরো বললেন, আর এই স্লাভ ও আলেমান রক্তওলা রুশদের মধ্যে সংঘর্ষে কার যে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে, তা-ই এখনো আমি বুঝতে পারছি না?

সম্রাট কিছু করুন, বললেন ডাক্তার হামিনে, তাঁর তো বিশুদ্ধ স্লাভ রক্ত। কী করে আমাদের দেশ থেকে বৈদেশিক উৎপাত হঠানো যায় তিনি নিশ্চয়ই সেটা সবচেয়ে ভালো বুঝবেন।

সত্যিই একটা-কিছু করুন তিনি অবশেষে, ইলকা বেশ আবেগ দিয়েই বললে, সাতশো বছর ধরে, আলেমান বিজয়ের পর থেকে, আমাদের চাষীমজুররা বিজেতার অত্যাচার ঠেকাবার চেষ্টা করছে-অথচ আশ্চর্য, এখনও আলেমানরা এ-দেশে রয়ে গেছে!

তোমার বাবা, ইলকাকে মনে করিয়ে দিলেন ডাক্তার, তোমার বাবা তো কী ভীষণ দুঃসাহসের সঙ্গে আমাদের হয়ে লড়েছেন।...তাঁরই হাতে স্লাভদের নেতৃত্ব পড়া উচিত সেটাই সংগত হবে।

লড়েছেন যেমন, তেমনি দুর্ধর্ষ একেকটা শও তৈরি করেছেন, মন্তব্য করলেন দ্যলাপোর্ৎ।

আর তাদের মধ্যে প্রধান হলো ইয়োহাউজেন ভাইগুলো, ডাক্তার সায় দিলেন, ধনকুবের একেকটা ব্যাঙ্কার—দিমিত্রি নিকোলেফ যেদিন রিগা পৌরসভার ভার নেবে, সেদিন তারা তো একেবারে জলে-পুড়ে মরবে। আমাদের শহরে রুশীদের সংখ্যা ছাব্বিশ হাজার, আর লাটরা সবশুদ্ধ চব্বিশ হাজার--অথচ আলেমানরা সংখ্যায় মাত্র চুয়াল্লিশ হাজার! স্লাভরাই দলে ভারি—আমি ঠিক জানি তারা নিকোলেফকেই ভোট দেবে!

বাবার তেমন উচ্চাশা নেই, ইলকা প্রতিবাদ করলে, কেবল স্লাভরা নিজের দেশে নিজেরা সব ভার পেলেই তিনি খুশি হবেন।

আগামী নির্বাচনেই সেটা হবে, মাদ্মোয়াজেল ইলকা, দ্যলাপোর্ৎ তাকে আশ্বস্ত করলেন, আর দিমিত্রি যদি নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজি হয়...

বাবার অবস্থা তো মোটেই সচ্ছল নয়—নির্বাচনে দাঁড়াতে গেলে মস্ত একটা বোঝ কাঁধে এসে চাপবে, ইলকা বাধা দিয়ে বললে, আর আপনি তো এটা জানেন, ডাক্তার, যে লোকসংখ্যার হিশেব থেকে যে-হদিশই মিলুক না কেন রিগা আসলে যতটা-না রুশ শহর, তার চেয়েও অনেক বেশি জর্মান।

দ্বিনা নদীর জল বয়ে যাক, ডাক্তার আবেগে ভরে গেলেন, পুরোনো সব ধ্যান-ধারণা ভেসে যাবে তার জলে, উজান বেয়ে আসবে নতুন ধ্যান, নতুন ধারণা...আর সেই ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হবে দিমিত্রিই।

ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই, মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ। বাবাকে আপনারা খুবই ভালোবাসেন, কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। দ্যাখেননি কি মাঝে-মাঝে বাবা কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েন-আর তাঁর মন-খারাপ হয়েছে দেখলেই আমার ভারি অস্বস্তি হয়।

দ্যলাপোর্ৎ ও হামিনে—দুজনেই দিমিত্রির এই হঠাৎ-হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়াটা লক্ষ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল ধরেই দিমিত্রি নিকোলেফ কী-একটা বিষয় নিয়ে যেন বড় ভাবিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দিমিত্রি মানুষটা খুব চাপা ধরনের, সহজে কারু কাছে মন খোলেন না, ছেলেমেয়েদেরও সহজে কিছু বলেন না, এতদিনকার বন্ধু হামিনেকেও কিছু না। সেইজন্যেই কখনও অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তিত হয়ে পড়লে আরো জেদ করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি-কাজকর্মই তাঁর সান্ত্বনা ও আশ্রয়, হয়তো কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সব ভুলে থাকতে চান। অবিশ্যি তৎসত্ত্বেও রিগার সমস্ত স্লাভ বাসিন্দাই তাকে নতুন পৌরসভার ভাবী প্রতিনিধি বলে মনে করতো।

+

এটা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বলটিক দেশগুলোকে রুশী করে ফ্যালো—এই ভাবনাটা ততদিনে শতাব্দী-প্রাচীন হয়ে উঠেছে। একদিন এই দেশজোড়া জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন

দেখেছিলেন ক্যাথরিন দি গ্রেট। বড়ো-বড়ো গ্রাম ও শহরের শাসনযন্ত্র থেকে ততদিনে জর্মান অপসারণের কাজ শুরু হয়ে গেছে; আঞ্চলিক পরিষদ গুলোর প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হলে নাগরিকদের ততদিনে বাধ্যতামূলকভাবে কতগুলো দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। বলটিক দেশগুলোর লোকসংখ্যা হবে প্রায় কুড়ি লক্ষ-তার মধ্যে ইহুদি সমেত আলেমানদের সংখ্যা হবে মাত্র দেড় লক্ষ। কাজেই রাজ্যপাল বা উচ্চপদে আসীন কর্মচারীদের পরিচালনায় স্লাভদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টাটা খুব সহজেই সফল হচ্ছিলো। দ্বন্দ্বটা এখন শুরু হয়েছে পৌরসভা নিয়ে–বর্তমান পৌরসভায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব এক ব্যাঙ্কার পরিবারের—ইয়োহাউজেনদের।

রিগার শহরতলিতে, নিকোলেফ পরিবারের সাধারণ পৈতৃক বাড়িটা যেখানে ছিলো, অধ্যাপক নিকোলেফের শ্রদ্ধা ও সম্মান খুব;এদিকটায় প্রায় আট হাজার রুশীর বাস।

ইলকার বয়স চব্বিশ, কিন্তু এখনও যে তার বিয়ে হয়নি, তার কারণ কি দিমিত্রির আয় বেশি নয়? অন্যান্য দেশের মতো লিভেনিয়ার প্রচল কী? মেয়ের সুন্দর মুখই কি তার ঐশ্বর্য, তারপরে যৌতুক কি কেবল গুণপনা আর লাবণ্য হলেই চলে? না, এখানকার স্লাভদের মধ্যে টাকাকড়িই ভালো বিয়ের একমাত্র উপাদান নয়। সেইজন্যেই ইলকার পাণিপ্রার্থনা করে মাঝে-মাঝে যে প্রস্তাব আসতো না, তা নয়; কিন্তু আশ্চর্য, দিমিত্রি আর তাঁর কন্যা সব রাজযোটক বিয়ের প্রস্তাবও এতকাল বারেবারে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন।

তার একটা কারণ অবিশ্যি আছে। কয়েক বছর আগে দিমিত্রির এক বন্ধু মিখায়েল ইয়ানোফ বলে এক স্লভের একমাত্র ছেলের সঙ্গে ইলকার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো।

ইয়ানোফদের বাড়িও রিগায়, এই একই শহরতলিতে; ভ্লাদিমির ইয়ানোফ পাত্র হিশেবে যোগ্যই–বয়েস তার বত্রিশ, ওকালতি করে, বেশ নাম করেছে এর মধ্যেই। বয়েসের ব্যবধান সত্ত্বেও ভ্লাদিমির আর ইলকা ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে বড়ো হয়েছে। এই গল্প শুরু হবার চার বছর আগে, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, বাগদান হয়ে গিয়েছিলো–তরুণ ব্যবহারজীবীর বয়েস তখন ছিলো আটাশ, আর পাত্রীর বয়েস কুড়ি। ঠিক ছিলো বিয়েটা হবে সেই বছরেই। ও বিয়ের কথা খুব একটা রটানো হয়নি–দুই বাড়িরই গোপন কথা হয়ে ছিলো এটা। বাগদানের ব্যাপারটা এতই গোপনে ছিলো যে বন্ধুবান্ধবরা পর্যন্ত তার টুঁ-শব্দটি শোনেনি। তারপর যেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বিয়ের উৎসব হবে, অমনি হঠাৎ সব জল্পনা ভেস্তে গেলো—এলো এক নিদারুণ আঘাত।

জারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে-সব গোষ্ঠী রচিত হয়েছিলো, তারই একটায় যোগ দিয়েছিলো ভ্লাদিমির ইয়ানোফ। এই গোষ্ঠি অবশ্য সরাসরি জারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামেনি, কেবল আদর্শের দিক দিয়ে স্বৈরাচারকে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলো—কিন্তু সন্দেহপরায়ণ কর্তৃপক্ষ সরাসরি সংঘর্ষ আর আদর্শগত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কোনো ব্যবধান দেখতে পাননি।

সব চেষ্টার আশু মূলোচ্ছেদ করতে হলে আইনের বালাই রাখলে চলে না–তার উপর কর্তৃপক্ষ যা-খুশি তাই করতে পারে। কাজেই সারা দেশে ধরপাকড় শুরু হয়ে গেলো, শহরেশহরে গ্রেফতার হলো লোক; রিগাতেও গ্রেফতার হলো একজন—ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে তার বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, পাঠিয়ে দেওয়া হলো পূর্ব-সাইবেরিয়ার মিনুসিংস্ক খনিতে। আর কি সে কোনোদিন ফিরে আসবে? সাইবেরিয়ায় একবার যে যায়, সে কি আর কখনও ফেরে? এই দুরাশা করবে কে?

দুই পরিবারই দারুণ ঘা খেলো এতে–সারা শহর তাদের সঙ্গে ব্যথিত হলো। এই চোটটা ইলকা হয়তো সামলাতেই পারতো না, কিন্তু তার ভালোবাসাই তাকে জিইয়ে রেখে দিলে। বাগদত্তকে ছেড়ে সে থাকবে না, তার সঙ্গেই যাবে নির্বাসনে, কেবল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেই হয়—আর সেই অনুমতি পাবার প্রত্যাশাতেই সে কোনোরকমে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু, ইতিমধ্যে, ভ্রাদিমিরের পরিণাম কী হয়েছে? সত্যি-সত্যি তাকে কোথায় পাঠানো হয়েছে, সে-খবর কিছুতেই পাওয়া গেলো না। এই চার বছরেও ইলকা সে-সম্বন্ধে কোনো খবর পায়নি।

ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবার ছ-মাসের মধ্যেই মিখায়েল ইয়ানোফ টের পেলেন যে তার অন্তিম দশা উপস্থিত। কালমাত্র বিলম্ব না করে তিনি তার সব সম্পত্তি বেচে দিলেন- বেশি হলো না, সবসুদ্ধ মাত্র ২০,০০০ রুবল পাওয়া গেলো ব্যাঙ্কনোটে—সব টাকা মিখায়েল পাঠিয়ে দিলেন দিমিত্রিকে, তার ছেলের জন্য গচ্ছিত রাখলেন। কাজটা এমন গোপনে চোকানো হলো যে এমনকী ইলকাও তা ঘূণাক্ষরেও টের পেলে না। সব টাকা দিমিত্রি গোপনে তুলে রেখে দিলেন।

কস্মিনকালেও যদি জগৎ থেকে মানুষের মর্যাদা ও বিশ্বাস হারিয়ে যায়, তবে তার শেষ আশ্রয় হবে লিভোনিয়া-এ-রকম একটা প্রবাদ আছে। এমন-সব চমকপ্রদ প্রেমিকপ্রেমিকারও খবর মেলে সেখানে, যারা নাকি এমনকী কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে দূর থেকে ভালোবেসে তবে বিয়ে করে—বিয়ে না-করে এতদিন কাটাবার কারণ আর-কিছু নয়, তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা না-পেয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। ভ্লাদিমির আর ইলকার বেলায় অবিশ্যি এ-কথা খাটে না—কারণ সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠায় কোনো

প্রশ্নই তাদের মধ্যে ছিলো না। ইলকার ছিলো না কিছুই, আর তরুণ ব্যবহারজীবীও তার কাছ থেকে কিছুই চায়নি–এমনকী তার বাবা তার জন্য কী রেখে গেছে, তাও সে জানতো না। তার ছিলো প্রচণ্ড মেধা ও প্রতিভা, আর ভবিষ্যৎকেও সে ডরাতো না। ভ্রাদিমির তো গেলো নির্বাসনে, কিন্তু ইলকা জানতো যে তার বাগদত্ত তাকে কোনোকালেই ভুলে যাবে না, সেও তাকে কখনও ভুলতে পারবে না। যুগল আত্মার দেশ নয় কি লিভেনিয়া?...মাটির পৃথিবীতে প্রায়ই এই যমল আত্মার মিলন হয় না, যদি-না ভগবান দয়া করেন। না-হলে শাশ্বত মিলন ছাড়া আর উপায় কী-চিরন্তন মুহূর্তের মধ্যেই তাহলে পরস্পরে লীন হতে হয়।

ইলকা বসেই রইলো পথ চেয়ে, আর তার মনপ্রাণ পড়ে রইলো ভ্লাদিমিরেরই সঙ্গে, নির্বাসনে। যদি ভগবানের দয়া হয়, যদি সে ক্ষমা পায়—সম্ভবনা অবিশ্যি খুবই কম কিন্তু যদি সে ফিরে আসে। নিজেকে তার শুধুমাত্র বাগদত্তা বলেই মনে হয় না, সে যেন তার পরিণীতা, তার স্ত্রী। ভ্লাদিমির যদি না-আসে তো সে-ই তার কাছে যাবার জন্যে অনুমতি চাইবে। কিন্তু সে চলে গেলে তার বাবার দশা কী হবে? একলা, বুড়োমানুষ বাবা!

সব সত্ত্বেও ইলকা কিন্তু সবচেয়ে দামি কথাটাই জানতো না। দিমিত্রি নিকোলেফ কিছুতেই কিছু খুলে বলবেন না—যদিও কথাটার মধ্যে এমন কিছু নেই, যেটা গোপন রাখা চলে। কিন্তু বলবেনই বা কেন? এই মুহূর্তের দুঃখকে আরো দুর্বিষহ করে তুলে ভাবী বিপদের কথা বলে লাভ কী। শিগগিরই ইলকা সব জানতে পারবে—ফয়সালা হবার দিন এগিয়ে এলো বলে।

দিমিত্রি নিকোলেফের বাবা রিগায় ব্যাবসা করতেন। মারা যাবার সময় ব্যাবসার অবস্থা মোটেই ভালো ছিলো না, ধারে-কর্জে ব্যাবসাটাই বিকিয়ে যেতে বসেছিলো। সেই ঋণ শোধ করতে গেলে চাই নগদ পঁচিশ হাজার রুবল। বাবা দেউলে হয়ে যান, এটা দিমিত্রি চাননি–কাজেই ঠিক করেছিলেন তিনিই সব ধার শোধ করে দেবেন। নিজের স্থাবর-অস্থাবর সব কুড়িয়ে-বাড়িয়ে মাত্র কয়েক হাজার রুবল তিনি যোগাড় করেছিলেন। বাকি টাকাটা শোধ করে দেবার জন্যে সময় দেয়া হয়েছিলো তাঁকে; প্রভূত কৃচ্ছসাধন করে একটু-একটু করে বাকি টাকাটা তিনি অ্যাদ্দিন ধরে শোধ করছিলেন। উত্তমর্ণ আর কেউ নয়, ইয়োহাউজেনরা। দিমিত্রি নিকোলেফ পিতার ঋণ কাঁধে নিয়ে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে এখনো সে-টাকা তিনি শোধ করতে পারেননি—এখনও আঠারো হাজার রুবল দেনা রয়েছে, তাঁর কাছে যেটা একটা বিপুল অঙ্ক। এদিকে বকেয়া টাকা চুকিয়ে দেবার তারিখ হচ্ছে আগামি পনেরোই মে-আর পাঁচ সপ্তাহও বাকি নেই।

ইয়োহাউজেনরা আর দেরি করতে রাজি হবে না—নতুন কোনো তারিখই তারা দেবে না। শুধু যদি ব্যাঙ্কার বা ব্যাবসাদারদের সঙ্গে নিকোলেফের কারবার হতো, তাহলে না-হয় কথা ছিলো; কিন্তু ইয়োহাউজেনরা তাঁর রাজনৈতিক শত্রু–লোকের মতে তারই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ইয়োহাউজেনদের বড়ো ভাই ফ্রাঙ্ক—সে-ই ব্যাবসার কর্ণধার; ঐ দেনার দরুন সে তাঁকে প্রায় কিনে রেখেছে।

ফ্রাঙ্ক তাঁকে ছেড়ে কথা কইবে না—মোটেই দয়া করবে না।

ডাক্তার, রাজদূত আর ইলকা আরো আধঘণ্টা ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলে, কিন্তু বাবার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ইলকা ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ছিলো। হঠাৎ এমন সময় দিমিত্রি দরজার কড়া নাড়লেন।

দিমিত্রির বয়স মাত্র সাতচল্লিশ, কিন্তু দেখে মনে হয় বুঝি আরো দশ বছরের বড়ো। লম্বায় মাঝারি মাপের, দাড়িতে পাক ধরেছে, কপালে রেখা পড়েছে—বিষণ্ণ হলেই বা গম্ভীর হলেই ভাঁজ পড়ে কপালে, কিন্তু মানুষটা এমনিতে বেশ বলিষ্ঠ। মর্মভেদী দৃষ্টি তার, যুবা বয়স থেকেই তাঁর চাউনি এই রকম-ভরাট গলা, যেন সোজা বুক থেকে আওয়াজ ওঠে।

বৃষ্টিভেজা কোট ছাড়তে-ছাড়তে ঘরে ঢুকলেন দিমিত্রি। টুপি খুলে রাখলেন একটা আরাম-চেয়ারের মাথায়, তারপর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে দুই বন্ধুর হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

ইলকা তিরস্কার করে বললে, তুমি বড় দেরি করেছে, বাবা!

আটকে গেলুম হঠাৎ, দিমিত্রি বললেন, বড় বেশিক্ষণ পড়াতে হলো।

নাও, চা নাও, ইলকা বললে।

যত খুশি পড়াও, কিন্তু দেখো, খামকা ক্লান্ত হয়ো না, ডাক্তার বললেন, নিজেকে এভাবে বাজে খরচ কোরো না, দিমিত্রি। তোমাকে দেখে আমার ভালো ঠেকছে না। কয়েকদিন বিশ্রাম নাও না।

বিশ্রাম? তা অবিশ্যি মন্দ নয়, নিকোলেফ সায় দিলেন, তা, ও কিছু না—একটা রাত বিশ্রাম নিলেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। নাও, তোমরাও চা নাও। তোমাদের মিথ্যে আটকে রাখতে চাই না। আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে চাই।

বাবা, কী হয়েছে, বলো। কিছু লুকিয়ো না, ইলকা সোজা তার বাবার চোখের দিকে তাকালে।

কিছু হয়নি। তুই যদি অত ভাবিস, শেষটায় হামিনে আমার কাঁধে একটা মনগড়া অসুখ চাপিয়ে দেবে—আমাকে সারিয়ে তোলার সুখ পাবার জন্যে যা-তা একটা রোগের নাম বলে বসবে!

উঁহু, ডাক্তার মাথা নাড়লেন, কিছু-কিছু লোক আছে, যারা রোগ পুষে রাখে, কিছুতেই সারাতে চায় না।

নতুন কিছু শুনেছেন নাকি, মঁসিয় নিকোলেফ? দ্যলাপোর্ৎ জিগেশ করলেন।

উঁহু। কেবল শুনতে পেলুম গবর্নর-জেনারেল গোরকো হঠাৎ রিগায় ফিরে এসেছেন–অথচ তাঁর এখন সেন্ট পিটার্সবুর্গে থাকার কথা ছিলো।

বাঃ, চমৎকার! ডাক্তার খুশি হয়ে উঠলেন, এ-খবর পেয়ে ইয়োহাউজেন খুব-একটা খুশি হবে বলে মনে হয় না। তার আবার ও-মহল্লায় তেমন দহরম-মহরম নেই।

নিকোলেফের কপালে ভাঁজ পড়লো। দেনার দায়ে বিকিয়ে আছেন বলেই কি ইয়োহাউজেনের নাম শোনবামাত্র তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

চা তৈরি ছিলো–ইলকা সবাইকে চা ঢেলে দিলে। আরো আধঘণ্টা সবাই মিলে আলোচনা হলো। বলটিক দেশগুলোর দশা কী, রিগার অবস্থাও কি তথৈবচ, স্লাভ-আলেমান সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় উঠলো কথাপ্রসঙ্গে। রিগায় যে পৌরসভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল আকার নেবে, সে-বিষয়ে কারুরই কোনো সন্দেহ দেখা গেলো না।

দিমিত্রি বসে বসে কী যেন ভাবছিলেন। বড় আনমনা দেখাচ্ছিলো তাঁকে। যদিও মাঝে-মাঝেই তাঁর মত চাওয়া হচ্ছিলো তবু তিনি বিশেষ হু-হাঁ করলেন না। তাঁর মন যেন অন্যত্র পড়ে আছে। কিন্তু কোথায়?... কেবল তিনিই জানেন। তাঁর কাছে যখন বিশদ মত চাওয়া হলো, তিনি কেবল দু-এক কথায় সারতে চাইলেন–কিন্তু তাঁর এই এড়িয়ে যাওয়াটা ডাক্তারের মোটেই মনঃপূত হলো না।

শোনো, দিমিত্রি, ডাক্তার ফের বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটেই রিগায় বসে নেই।...কোনখানে পড়ে আছে তোমার মন?...নাকি তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছো?... লোকে তোমাকে চায়, কর্তৃপক্ষও তোমার উপরেই সদয়...তুমি কি চাও যে ইয়োহাউজেনই আবার নির্বাচনে জিতুক?।

আবারও সেই নামটা। ওই নামটা শোনবামাত্র দিমিত্রির সর্বাঙ্গ কেবল কেঁপে ওঠে। হামিনে, নিকোলেফ বললেন, ইয়োহাউজেনদের শক্তি কতটুকু তোমার জানা নেই।

ওরা যতটা ঢক্কানাদ করে, তার চেয়ে অনেক কম। সে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে, ডাক্তারও অমনি বলে উঠলেন।

+

সাড়ে-নটা বাজলো ঘড়িতে। ডাক্তার হামিনে আর মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লেন। আবহাওয়া বিশ্রী হয়ে আছে। হাওয়ার ঝাপটা লাগছে জানলায়। কনকনে ঠাণ্ডা। বৃষ্টিও পড়ছে। বাইরে রাস্তার কোণে হাওয়া শোঁ-শোঁ শিস দিচ্ছে, এমনকী চিমনি দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা আসছে মাঝে-মাঝে, আর অমনি লাফিয়ে নেচে উঠছে চুল্লির আগুন।

কী ঝড় বাইরে! দ্যলাপোর্ৎ বলে উঠলেন।

এমনকি কোনো ডাক্তারও এই ঝড়বাদলে বাড়ি ছেড়ে বেরুতে চাইবে না, হামিনে ঘোষণা করলেন। আসুন, দ্যলাপোং। আমার কোচবাক্সে করে আপনাকে পৌঁছে দেবো–আমার এই চাকাছাড়া দু-পেয়ে কোচবাক্স...

অনেকদিনকার অভ্যাসবশত ডাক্তার ইলকার কপালে চুমু খেলেন, বন্ধুর হাতে দিলেন। মস্ত ও সহৃদয় ঝাঁকুনি—আর বন্ধু তাদের সদর দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। তারপরেই অতিথিরা ঝড়ের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

ইলকা গেলো বাবাকে শুভরাত্রি জানাতে। নিকোলেফ যেন অন্য দিনের চেয়েও একটু বেশি আদর করলেন মেয়েকে।

আচ্ছা বাবা, ভালো কথা, ইলকা বললে, তোমার কাগজ তো দেখতে পেলুম না। ...পিয়ন দিয়ে যায়নি?

দিয়ে গেছে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরবার সময় পিয়নের সঙ্গে রাস্তায় দেখা—আমাকে হাতে-হাতেই দিয়ে দিয়েছে কাগজটা।

কোনো চিঠি আসেনি?

না, ইলকা, চিঠি ছিলো না।

রোজ, চার বছর ধরে রোজ রাত্রে সেই একই উত্তর--না তো, চিঠি আসেনি তো। চিঠি নেই—অন্তত সাইবেরিয়া থেকে কোনো চিঠি আসে না একদিনও। ইলকার চোখের জলে একদিনও কোনো চিঠির তলায় ভ্লাদিমির ইয়ানোফ নামটা ধুয়ে যায় না—একদিনও না — কোনোদিনও না।

শুভরাত্রি, বাবা, আস্তে বললে ইলকা।

শুভরাত্রি।

.

৪. ডাকের গাড়িতে

পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে না-যেতে চাইলে বলটিক দেশগুলোর অন্তহীন সমভূমিতে পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র দুটি। এক হচ্ছে রেলপথ-রেফেল থেকে সেন্ট পিটার্সবুর্গ অব্দি মস্ত রাস্তা গেছে রেলের। আর আছে ডাকগাড়ি বা তেলেগু, তাছাড়া আর-কোনো গাড়িই এদিকে চলে না–আর তেলেগু্য হচ্ছে পাজির পাঝাড়া, দারুণ তার বদনাম—আসলে খামারের চার-চাকার বিশ্রী গাড়ি ছাড়া তা আর কিছু নয়। আর ডাক-বওয়া কোচবাক্সটি ততটা আদিম হয়তো নয়। ঠিক গোরুর গাড়ি নয়, বরং ডাকগাড়িকে বলা যায় রীতিমতো একটা শকটই–কিন্তু ভিতরটা নিঃসন্দেহে আরো আরামপ্রদ করা যেতো অনায়াসেই। তবে ঝড়-বৃষ্টিহাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে। ভিতরে বসবার জায়গা থাকে মাত্র চারটে-সপ্তাহে দু-বার করে এই ডাকের গাড়ি রিগা থেকে রেফেল-এ যাতায়াত করে।

১৩ই এপ্রিল সকালবেলায় রেফেল-এর উদ্দেশে যে-ডাকগাড়িটি ছাড়বে বলে অপেক্ষা করছিলো, তার একমাত্র যাত্রীটি তখনও এসে পৌঁছোয়নি। আগের দিনই যাত্রীটি আগাম মাশুল দিয়ে ডাকগাড়ির আসনটা ভাড়া করে গিয়েছিলো। ভদ্রলোকের বয়েস হবে প্রায় পঞ্চাশ; ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় গাড়ি ছাড়বার সময় এসে হাজির হলো সে। দিব্যি হাসিখুশি মানুষ, প্রফুল্ল বয়ান, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, বেশ তাগড়াই একটা জ্যাকেটে গা মুড়ে রেখে কানঢাকা মাথাঢাকা একটা ওভারকোট চাপিয়েছে তার উপর, বগলে আঁটো করে ধরে রেখেছে একটা ব্রীফ-কেস।

আপিশে ঢুকতেই মেইল-কোচের কনডাকটার সম্ভাষণ জানালে, আরে—পোখ! তাহলে তুমিই ডাকগাড়ির আসন ভাড়া করেছিলে?

হ্যাঁ, ব্রোক্স।

তাহলে তেলেতে গেলে তোমার আর মন ওঠে না আজকাল!..দিব্যি একটা তিন ঘোড়ার কোচবাক্স চাই নিজের তাঁবে?

আর তাছাড়া তোমার মতো সদাজাগ্রত প্রহরীও চাই কিনা?

অর্থাৎ, ছোটো বাবা, খরচের অঙ্কটা ধর্তব্যেই পড়ে না...

না, বিশেষ করে টাকাটা যখন আমি দিচ্ছি না।

কে দিচ্ছে তাহলে?

বড়ো কর্তা স্বয়ংহের ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন।

হুমকনডাকটার বলে উঠলেন, তা তিনি ইচ্ছে করলে অবিশ্যি আস্ত কোচবাক্সটাকেই কিনে নিতে পারেন!

তা ঠিকই বলেছো। তবে কিনা, ব্রোক্স, আমি কেবল একটা টিকিটই কিনেছি—দু-একজন সঙ্গী ছাড়া চলে কী করে। সঙ্গে কেউ থাকলে রাস্তাটা অত একঘেয়ে আর বিরক্তিকর ঠেকে না...

বেচারা! তাহলে আজ তোমাকে সঙ্গী ছাড়াই যেতে হবে। এ-রকম অবিশ্যি রোজ হয় না, তবে আজকে...আজকে কেবল একটাই টিকিট বিক্রি হয়েছে, আর সেটা তোমার।

সে কি! আর কেউ যাবে না?

না। যদি-না রাস্তায় আর-কাউকে তুলে নিই তো সারাক্ষণ আমার সঙ্গেই বকবক করতে হবে...উঠে পড়ে, উঠে পড়ো। তা আর কী করবে—তাতে তো আর জখম হয়ে যাবে না! আর তুমি তো জানোই-একটু-আধটু কথাবার্তায় আমার কিছু এসে যায় না।

না, ব্রোক্স, তাতে আমারও কিছু ফোঁসকা পড়ে না।

কোথায় যাচ্ছো বলো দিকি?

একেবারে শেষ অব্দি–রেফেল-এ–ইয়োহাউজেনের এক প্রতিনিধির কাছে। বলে পোখ তার ব্রীফ-কেসের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে ইঙ্গিত করলে–তামার শেকল দিয়ে ব্রীফ-কেসটা তার কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা।

আরে-আরে, ছোটো বাবা, ব্রোক্স বললে, ও-রকমভাবে কথা বোললা না!...আমাদের দেখছি শেষ অব্দি একা যেতে হবে না!

সত্যিই সেই সময়ে আরেকটি যাত্রী হন্তদন্তভাবে আপিশে এসে ঢুকে পড়েছিলো। পোখএর ইঙ্গিতটা সে দেখেছে কিনা, ঠিক বলবার জো নেই।

কেউ যাতে তাকে চিনতে না-পারে, যাত্রীটি সেইজন্য যথেষ্ট সাবধান হয়ে এসেছে। আপাদমস্তক মুড়ে রেখেছে ওভারকোটে, টুপিটা শুদ্ধ চোখ পর্যন্ত নামিয়ে সে মুখ ঢেকে

রেখেছে। কনডাকটারের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে জিগেশ করলে, কোচবাক্সে আর-কোনো খালি আসন আছে?

তিন-তিনটে আসন খালি পড়ে আছে, উত্তর দিলে ব্রোক্স।

একটা হলেই চলবে। কদ্দুর যাবেন? রেফেল?

হ্যাঁ...রেফেল, একটু ইতস্তত করে বললে যাত্রীটি, তারপর কাগজের নোটে ভাড়ার টাকা গুনতে গুনতে কাটা-কাটা গলায় জিগেশ করলে, কখন ছাড়বে?

দশ মিনিটের মধ্যেই।

সন্ধেবেলায় কোথায় গিয়ে পৌঁছবো?

আবহাওয়া খারাপ না-থাকলে পেরনাউ অবধি চলে যেতে পারবো। তবে এই ঠাণ্ডা ঝড়-বাদলে সে কি আর ঠিক করে বলা যায়?

কী মনে হয় তোমার? রাস্তায় থামতে-টামতে হবে নাকি? এবার কথাটা জিগেশ করলে পোখ।

হুম, ব্রোক্সকে একটু ভাবিতই দেখালো, আকাশের চেহারা তো ভালো ঠেকছে না। বড্ড তাড়াতাড়ি মেঘ জমছে!...তবে কেবল যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে ভয় পাই না। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি তুষার-ঝুরিও নেমে বসে...

ব্রোক্স, শোনো, পাশের ঘোড়ার সোয়ারদের যদি একটু-আধটু ভোদকা গিলতে দাও, তাহলে কাল সন্ধের মধ্যেই আমরা রেফেল পৌঁছে যাবে।

আশা তো করি তাই। ছত্রিশ ঘটা-তার বেশি সচরাচর লাগে না।

তাহলে, পোখ বললে, এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়লে হয় না? খামকা পায়চারি করে কী লাভ?

ঘোড়াগুলো তো তৈরিই আছে, জিন পরানো, লাগাম মুখে, বোক্স বললে, আর কারু জন্যে অপেক্ষাও করছি না...এক পেয়ালা গলায় ঢালা যাক পোখ, চাঙ্গা হয়ে নেয়া যাক—স্নাপস না ভোদকা?

স্নাপস, ব্যাঙ্কের হরকরা জানালে।

গেলো দুজনে সরাইখানায়। কোচোয়ানের সহকারী-যে পাশের ঘোড়াটা শামলাবেতাকেও পিছন-পিছন আসতে ইঙ্গিত করে গেলো। দু-মিনিট বাদেই তারা ফিরে এলো। কোচবাক্সে। অচেনা যাত্রীটি ততক্ষণে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। পোখ তার পাশে গিয়ে বসলো, চাকার শব্দ হলো ঘড়ঘড়, আর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিশে গেলো তার সঙ্গে। যেতিনটে ঘোড়া কোচবাক্সে জোতা হয়েছিলো, তারা আকারে ছোটো কিন্তু ভারি তেজিয়ান ও টগবগে। শিস দিলেই কাজ হয়—জোর কদমে ছুটে চলে তারা।

ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কে অনেক দিন ধরে চাকরি করছে পোখ। চাকরিতে ঢুকেছিলো অত্যন্ত অল্প বয়েসে, একেবারে পেনশন নেবার আগে পর্যন্ত এই কাজই সে করে যাবে। প্রভুর

আস্থাভাজন সে, প্রায়ই মস্ত বড়ো-বড়ো অঙ্ক নিয়ে ব্যাঙ্কের নানা জায়গার প্রতিনিধিদের কাছে যেতে হয় তাকে—যেতে হয় রেফেল, পেরনাউ, মিটটাউ বা ডোরপাট--শুধু কোচবাক্সওলাদের হাতে এত টাকা ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলেই এ-সব ক্ষেত্রে সে সঙ্গে যায়। তার ব্রীফকেসে এখন আছে পনেরো হাজার রুবল। রেফেল-এর প্রতিনিধির হাতে এ-টাকাটা তুলে দিয়ে আবার সে রিগায় ফিরে আসবে।

যত শিগগির ফিরে আসতে পারে ততই ভালো। ফেরার তাড়াটা মশু। কেন তার এত তাড়াহুড়ো, তা হয়তো ব্রোক্সের সঙ্গে তার কথাবার্তা থেকেই আমরা জেনে নিতে পারবো।

+

রুশী ধরনে লাগাম ধরে আছে কোচোয়ান, হাত দুটো সামনে বাড়ানো, ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিচ্ছে খুব করে। শহরের উত্তরভাগ থেকে রওনা হয়েছিলো গাড়ি–এখন অনন্ত স্তেপির উপর দিয়ে গেছে মস্ত রাস্তা–আর তারই উপর দিয়ে যাচ্ছে কোচবাক্স।

আকাশের চেহারা মোটেই আশাপ্রদ নয়, ব্রোক্স আগেই সেটা দেখিয়েছিলো। মাঝে মাঝে ভীষণ দমকা হাওয়া ঝাঁপটা মেরে যাচ্ছে–সূর্য যখন দিগন্তের উপরে উঠলো, ঝোড়ো হাওয়ার প্রতাপও আরো বেড়ে গেলো। তবে ভাগ্য ভালো যে হাওয়া বইছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে।

কুড়ি মাইল পর পর একেকটা ঘাঁটি আছে–সেখানে কোচ বাক্সের ঘোড়া বদল করার ব্যবস্থা আছে, যাতে যাত্রীরা সুস্থ ও সতেজ ঘোড়ায় যেতে পারে–ক্লান্ত ঘোড়ার জন্য যাতে খামকা বেশি দেরি না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পোখ-এর মেজাজটা বিগড়ে গেলো। হাজার চেষ্টা করেও সে তার সহযাত্রীর মুখ থেকে টু শব্দটি বার করতে পারলে না-লোকটা যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে, কিছুতেই গল্পগুজবে যোগ দেবে না, সে বসে আছে গুটিশুটি মেরে এককোনায়। টুপিটা একেবারে চোখ অব্দি নামানো–কাউকেই সে তার শ্রীমুখ দেখাতে চায় না বোধহয়, এবং হয় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়তো ঘুমের ভান করছে। পোখ কত কথা পাড়লে কিন্তু কোনো কথারই কোনো উত্তর এলো না।

এদিকে সারাক্ষণ বকবক না-করলে পোখ-এর আবার পেটের খাদ্য হজম হয় না, কাজেই ব্রোক্সের সঙ্গেই গল্প-গাছা করতে হলো তাকে শেষটায়। ব্রোক্স বসেছিলো কোচোয়ানের পাশে, চামড়ার একটা মাথাঢাকায় নিজেকে মুড়ে রেখেছিলো সে-যাতে হাওয়ার ঝাঁপটা গায়ে নালাগে। তবু কোচবাক্সের সামনে জানলার পাল্লাটা তুলে তারই সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাঁচলো পোখ। আর কোচবাক্সের রক্ষীটিও যেহেতু আড্ডা দিতে পারলে আর কিছু চায় না, তারও জিভ যেহেতু সারাক্ষণ শুড়শুড় করে, তাই তাদের বকর-বকর আর কিছুতেই থামতে চাচ্ছিলো না।

এবং চতুর্থবার আবার পোখ তাকে জিগেশ করলে, ঠিক বলছো তো, ব্রোক্স কাল সন্ধের মধ্যেই রেফেল-এ পৌঁছুতে পারবো তো?

হ্যাঁ, পোখ–যদি অবশ্য আবহাওয়া একেবারে বেশামাল হয়ে না-ওঠে। রাত্তিরে গাড়ি চালানো অসম্ভব হয়ে না উঠলে আমরা ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবো।

আর রেফেল-এ পৌঁছুবার চব্বিশ ঘণ্টা পরেই কোচবাক্স আবার ফিরে আসবে তো?

হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা পরেই আবার রওনা হবে, ব্রোক্স তাকে আশ্বস্ত করলে, ওই ভাবেই

তো টাইম-টেবিল তৈরি হয়েছে।

আবার তুমিই তো আমাকে রিগায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে? '

হ্যাঁ পোখ, আমিই–

সন্ত মিখায়েল-এর দোহাই–ইশ, এটা যদি ফিরতি পথ হতো–তোমার সঙ্গেই ফিরে আসছি, এটা যদি হতো!

তা তোমার অত তাড়া কীসের পোখ? আর আমার সঙ্গেই বা ফিরতে চাচ্ছো কেন?

কারণ তোমার একটা নেমন্তন্ন আছে, ব্রোক্স!

নেমন্তন্ন? আমার?

হ্যাঁ, তোমার। আর এই নেমন্তন্নে যেতে তোমার ভালোই লাগবে। ভালো-ভালো খাবার, দামি মদ–আর সঙ্গীরাও খুব ভালো।

তা, ব্রোক্স ঠোঁট চাটলো, ও-রকম একটা নেমন্তন্ন আমার পছন্দ না হলে আমি নিজের উপরেই যে চটে যাবো তা সত্যি...কেউ বুঝি ভূরিভোজে দিচ্ছে!

দূর! তার চেয়েও বেশি। একটা সত্যিকার বিয়ের ভোজ।

বিয়ের ভোজ! ব্রোক্স একটু অবাকই হলো, তা বিয়ের ভোজে খামকা আমাকে নেমন্তন্ন করবে কেন কেউ?

করবে এই জন্য যে বর তোমাকে খুব ভালোভাবে চেনে, জানে।

বর আমাকে চেনে?

কনেও তোমাকে চেনে।

তাহলে ব্রোক্স ঘোষণা করলে, এই সুখী যুগল কারা সেটা না-জেনেই আমি নেমন্তন্নটা গ্রহণ করছি।

জানবে না কেন? আমিই তোমাকে বলবো।

তাদের নাম বলার আগে, পোখ, এ-কথা আমাকে বলতে দাও যে ঐ ভাবী বরবধূ–তারা ভারি চমৎকার মানুষ।

চমৎকার মানুষ যে, তাতে আর সন্দেহ কী? কারণ আমিই সেই ভাবী বর কি না!

তুমি, পোখ!

হ্যাঁ ব্রোক্স, আমি। আর কনে কে জানো–ভজেনাইদা পারেনসোফ!

ওঃ চমৎকার! সত্যি, এর পরে আমার আর কোনো দ্বিধা নেই!

শুনে তুমি অবাক হলে নাকি?

উঁহু, মোটেই না। আর পোখ, তোমার বয়েস পঞ্চাশ হলেও এটা ঠিক জানি যে তোমরা দুজনেই বিয়ের পরে খুব সুখে থাকবে।

আমার বয়েস পঞ্চাশ, আর ভজেনাইদার পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু তাতে কী এসে যায়। কয়েক দিনের জন্যে তো আমরা সুখী হতে পারবো–আর সেটাই আসল। বুঝলে ব্রোক্স, যদি কখনো তুমি প্রেমে পড়ে যাও, তাহলে কিন্তু হুড়মুড় করে বিয়ে করে বোসো না-যদ্দিন পারো, বিয়েটা পিছিয়ে দিয়ো। আমি আর ভজেনাইদা প্রেমে পড়েছিলুম পঁচিশ বছর আগে–তখন আমার বয়েস ছিলো পঁচিশ, আর ভজেনাইদার কুড়ি। কিন্তু দুজনের সব টাকা কুড়িয়ে-বাড়িয়েই কুল্লে একশো রুবলও হয়নি–কাজেই অপেক্ষা করাটাই ছিলো বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত যদ্দিন না আমার কিছুটা টাকা জমে, আর তারও কিছু যৌতুক যোগাড় হয়, তদ্দিন আর ভাগাভাগি করে নেবার কী ছিলো বলো? এখন অবশেষে আমার পকেটে কিছু টাকা জমেছে–লিভোনিয়ার গরিব লোকদের পক্ষে কিছু টাকা জমানোই কী অসম্ভব কাজ তা তো জানো! যাই হোক, বছরের পর বছর ধরে আমরা কেবল আশাই

করে গেছি কিন্তু তাতে ভালোবাসায় ভাটা পড়েনি। তারপর অবশেষে একদিন ভবিষ্যতের ভার ও ভাবনা চলে গেলো।

তুমি হক কথাই বলেছে, পোখ।

ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কে আমার চাকরিটা এখন বেশ ভালো-বছরে পাঁচশো রুবল মাইনে। বড়ো কর্তা বলেছেন, বিয়ের পরে আরো কিছু বাড়িয়ে দেবেন। আর ভজেনাইদারও অল্পস্বল্প কিছু আছে। কাজেই আমরা এক অর্থে এখন বেশ ধনীই–মানে আমাদের পক্ষে যতটা ধনী হওয়া সম্ভব। তাহলেও এই ব্রীফ কেসে যত টাকা আছে, তার সিকির সিকিও আমাদের নেই–

পোখ থেমে তার সহযাত্রীর দিকে সন্দেহের চোখে তাকালে। লোকটা সেই থেকে একবারও নড়েনি–বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো পোখ এরই মধ্যে বড্ড বেশি কথা বলে ফেলেছে।...তারপর পোখ আবার বলতে লাগলো, হ্যাঁ, ব্রোক্স–আমাদের নিজের ধরনে এখন বেশ ধনীই হয়ে পড়েছি! যা টাকাকড়ি আছে, তা দিয়ে ভজেনাইদা বোধ হয় একটা ছোটোখাটো মনোহারী দোকান খুলে বসবে।...বন্দরের কাছে একটা ছোট্ট মনোহারী দোকান বিক্রি হচ্ছে শিগগিরই।

অন্তত একজন ভালো খদ্দের পাবে তোমরা, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ব্রোক্স জানালে।

ধন্যবাদ, ব্রোক্স, আগাম ধন্যবাদ দিচ্ছি। বিয়েতে তোমাদের যে খানা খাওয়ানো হবে, অন্তত তার জন্যেই তোমার আমাদের দোকানের খদ্দের হয়ে

পড়া উচিত।

কোথায় খাওয়াবে? ভজেনাইদাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। বিয়ের পোশাকে ভজেনাইদাকে কী সুন্দর দেখাবে, দেখে নিয়ো। মাথায় থাকবে মার্টলের টোপর, মাদাম ইয়োহাউজেন আবার ওকে একটা নেকলেসও দিয়েছেন।

তা তো বটেই!...ভজেনাইদার মতো ভালো মেয়ের সুন্দরী না হয়ে উপায় কী! তা, বিয়েটা কবে?

আর চারদিন পরে, ব্রোক্স–ষোলো তারিখে। আর সেইজন্যেই তো আমি তোমাকে অত তাড়া দিচ্ছি। কোচোয়ানকে এটু বেশ করে কড়কে দাও তো হে–না-হয় এদের দু এক গেলাশ ভোদকাই খাইয়ে দেবো। কিন্তু ঘোড়াগুলো যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে না ছোটে! আরে বাপু, বিয়ের বর যাচ্ছে তোমাদের কোচবাক্সে–এক যাত্রাতেই তাকে বুড়ো হয়ে গেলে চলবে কেন?

না না, তা কী হয়! বুড়ো বরকে ভজেনাইদা হয়তো আর পছন্দই করবে, বলে ব্রোক্স হো-হো করে হেসে উঠলো।

উঁহু! ভজেনাইদা মোটেই সে-রকম মেয়ে নয়!...আমার বয়স যদি আরো কুড়ি বছর বেশিও হতো, তবু সে আমাকেই চাইতো।

ব্রোক্সের সঙ্গে পোখের এই হার্দ্য সম্পর্ক ও বন্ধুতার ফলেই শেষ পর্যন্ত। ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে কোচোয়ান ও সহিসরা ঢক ঢক করবে কিছুটা স্নাক্স গলায় ঢেলে নিয়ে এমনই

তাড়াহুড়ো করে গাড়ি ছোটালে যে রিগার ডাকগাড়ি কস্মিনকালেও এর আগে এত জোরে ছোটেনি। কুড়ি মাইল পর-পর ঘোড়াগুলো বদল হয়, জিন খোলা হয়, লাগাম খোলা হয়, ব্রোক্স আর পোখ মাটিতে নেমে আড়মোড়া ভেঙে হাত-পাগুলো একটু টান টান করে নেয়। কিন্তু সেই অচেনা যাত্রীটি একবারও তার আসন ছেড়ে উঠলো না, যদিও পোখরা নেমে গেলেই মাঝে-মাঝে সে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলো।

আমাদের সহযাত্রী দেখছি খুব একটা অস্থির নয়; যাকে বলে জাড্য, তাতেই সে ভরা, বললে পোখ।

তেমন বলিয়ে-কইয়ে লোকও তো নয়,বললে ব্রোক্স।

জানো নাকি লোকটাকে? কে সে?

জানি না। আরে বাপু তার দাড়ির রঙটা যে কী, তাই কখনো দেখিনি।

দুপুরবেলায় যখন আবার আরেক দফা বদলানো হবে, আর আমরা খাওয়াদাওয়া করবো, তখন অবিশ্যি তাকে শ্রীমুখ দেখাতে হবে...

সে যেমন বলিয়ে-কইয়ে, খাইয়েও যদি সে তেমনি তাহলে অবিশ্যি তার দরকার হবে না, তক্ষুনি ফোড়ন কাটলে ব্রোক্স।

বেলা একটা নাগাদ গাড়ি ঢুকলো একটা মস্ত গ্রামে। এখানে আরেক দফা ঘোড়া বদলানো হয়, সহিস কোচোয়ান জিরিয়ে নেয়, যাত্রীরা মধ্যাহ্নভোজ সাঙ্গ করে।

বড়োশড়ো একটা সরাইখানা আছে এই গ্রামে, আরামের ব্যবস্থা আছে, আর সেখানে যাত্রীরা বেশ ভূরিভোজ করে নেয়: শুয়োরছানার স্টু, কুষ্মাণ্ডর শুরুয়া, কালো রুটির কয়েক টুকরো, দিনা নদীর স্যালমন মাছ, শজিসমেত : টাটকা বেকন, কাভিয়ার, আদা-কুঁচি, মুলোর টুকরো, জামের চাটনি এবং স্যামোভার থেকে সদ্য নামানো ধোঁয়া-ওঠা অনিবার্য চা। চমৎকার ভোজ যাকে বলে, আর এই ভোজ ব্রোক্স আর পোখ-এর মেজাজ সারাদিনের জন্য বেশ শরীফ করে রাখলে।

অন্য যাত্রীটির উপরে কিন্তু এই মুখরোচক খাদ্যতালিকা তেমন সুখকর প্রভাব ফেললে না। রেকাবি ভর্তি খাবার নিয়ে সে গিয়ে বেছে-বেছে বসলো ঘরের এককোনায়, মাথার টুপি একবারও খুললো না, একবারও তার পাক-ধরা দাড়ি-গোঁফ দেখতে দিলে না কাউকে। খামকাই পোখ আর ব্রোক্স উঁকিঝুঁকি দিয়ে তার মুখটা নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করলে, কিন্তু সে তার কোনো সুযোগই দিলে না। চটপট নিজের খাবার খেয়ে নিয়ে অন্যদের অনেক আগেই গিয়ে নিজের আসন আবার দখল করে বসলো।

লোকটা কে বলো তো? আমরা কি তা কখনো জানতেও পাবো না? জিগেশ করলে পোখ।

আচ্ছা, আমি তোমাকে বলছি লোকটা কে, বললে ব্রোক্স।

তুমি ওকে চেনো নাকি?

নিশ্চয়ই। ঠিকঠাক ভাড়া দিয়ে একজন এসে গাড়িতে উঠেছে–বাস্! এই পরিচয়ই আমার কাছে যথেষ্ট।

দুটো বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকি, তখন আবার কোচবাক্স ছেড়ে দিলে। এবার বেশ জোর কদমেই ছুটছে ঘোড়াগুলো। সহিস কোচোয়ানের মুখে খই ফুটছে, সপ-সপ করে চাবুকের শব্দ হচ্ছে হাওয়ায় আর খুরের শব্দ হচ্ছে খটাখট। পোখ বোধহয় এতক্ষণে তার সব খবরের তহবিল শেষ করে ফেলেছিলো, কারণ এখন আর কনডাকটারের সঙ্গে তার কথাবার্তা তেমন জমলো না। তাছাড়া পেটভর্তি নরম-গরম সুস্বাদু খাবার, তার উপর ভোদকার ভাপ, কাজেই একটু পরেই সে ঘুমে ঢুলে পড়লো-ঘোড়ার খুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার হেলানো মাথাটা নড়তে লাগলো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো সে–সম্ভবত ভজেনাইদা পারেনসোফের দিব্য ও লাবণ্যময় উপস্থিতিতে তার স্বপ্নাতুর ঘুম ভরে গিয়েছে।

কিন্তু আবহাওয়া তখন ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। নিচু ভারি মেঘ ঝুলে আছে আকাশে। আর কোচবাক্স যাচ্ছে একটা জলাভূমি দিয়ে–ঠিক ঘোড়ার গাড়ি যাবার উপযুক্ত রাস্তা এটা নয়, ছোটো-ছোটো জলের ধারায় মাটি কীরকম ভেজা-ভেজা আর নরম, কতগুলো জায়গা বেশ এবড়োখেবড়ো।

মাটি যে-সব জায়গায় বড্ড বেশি নরম হয়ে পড়েছিলো, সে-সব জায়গায় গাছের ডাল কেটে পাতা হয়েছে, যাতে চাকা মাটির মধ্যে বসে না যায়। কিন্তু পদাতিকদের পক্ষেই তা যথেষ্ট নয়, কোনো যানবাহনের তো কথাই নেই। কতগুলো গাছের ডাল বড় বাজেভাবে পাতা হয়েছিলো, কোচবাক্সের চাকার তলায় তারা একেবারে ডেবে বসে গেলো বা কখনো সজোরে নড়ে উঠলো–বেশ ভয়ই করছিলো তাতে, যদি গাড়ি উলটে যায়। এই অবস্থায় কোচোয়ান ঘোড়াদের আর তাড়া দেবে কী করে। যাক তারা

নিজেদের ইচ্ছেমতো, সাবধানে। ঘোড়াগুলো টাল শামলাতে-শামলাতে চলেছে আস্তে-আস্তে, কোচবাক্সটা দুলছে। কয়েক জায়গায় দুর্ঘটনা হতে-হতেও হলো না। শেষটায় যখন ঘোড়াগুলো নতুন ঘাঁটিতে পৌঁছুলো, তখন এই বিষম রাস্তার ধকলে তারা ভারি কাবু হয়ে পড়েছে–ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা না থাকলে যে কী হতো বলাই যায় না; এই ঘোড়াগুলোকে দিয়ে যে কোনো কাজ চলতো না, তা তো বলাই বাহুল্য।

বেলা পাঁচটা নাগাদই বেশ অন্ধকার করে এলো। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ জমেছে। ঐ জলার মধ্যে দিয়ে ঠিক পথ চিনে চলাই মুশকিল। খুরের তলায় শক্ত মাটি পড়ছে না দেখে ঘোড়াগুলো বারে বারে ভীত ও চকিত হয়ে চিহি ডাক ছেড়ে পাশে সরে যেতে চাচ্ছে।

আস্তে, হট, আস্তে যেতেই হবে আমাদের! ব্রোক্স কেবলই বলতে লাগলো, মাঝরাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ার চেয়ে বরং এক ঘণ্টা দেরি করে যাওয়াই ভালো পেরনাউতে...হট...

এক ঘণ্টা দেরি! এক ঝটকায় পোখ-এর ঘুম ভেঙে গেলো।

সেটাই যথেষ্ট বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বললে কোচোয়ান। কয়েকবার এমনকী তাকেও নিচে নেমে পড়তে হয়েছে, লাগাম ধরে টেনে-টেনে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে ঘোড়াদের।

অন্য যাত্রীটি হাঙ্গামা দেখে নড়ে-চড়ে বসলো। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বাইরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে। নিরেট অন্ধকার–এই ঘন অন্ধকারে কোনো-কিছুই

চেনবার জো নেই। কোচবাক্সের লণ্ঠনের ছোটো-ছোটো টুকরো আলোয় অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে উঠলো।

কোথায় এসেছি আমরা? পোখ জিগেশ করলে।

পেরনাউ এখনো বারো মাইল দূরে, ব্রোক্স ব্যাখ্যা করলে, একবার ঘাঁটিতে পৌঁছুতে পারলে বাকি রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিতে হবে। সেটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ধুত্তোর! শয়তান ঝড়টাকে নিক...মাঝখান থেকে একদিন দেরি করিয়ে দিলে, চ্যাটাং করে জবাব দিলে বাক্সের লোকটি।

+

তবু তারা এগুতেই থাকলো। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ার ঝাঁপটায় গাড়িটাই উলটে যাবার ভয় হয়। ঘোড়াগুলো ফিরে দাঁড়াতে চায়-বা একপাশে সরে দাঁড়ায়–বা অন্ধকারে ঝপ খায়। অবস্থা ক্রমশই এত ভয়ানক হয়ে উঠেছে যে পোখ আর ব্রোক্স পায়ে হেঁটেই পেরনাউ যাবার কথা বলাবলি করছে; গাড়ির মধ্যে বসে থাকার চেয়ে হেঁটে যাওয়াটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে, হাওয়ার ঝাঁপটায় কখন কী হয় বলা যায় না।

অন্য যাত্রীটির ভাবগতিক দেখে মনে হলো না সে কোচবাক্স ছেড়ে যেতে রাজি হবে। চারপাশের এই তুলকালাম কাণ্ড দেখে কোনো ইংরেজও এতটা উদাসীন থাকত পারতো কিনা সন্দেহ। পকেটের পয়সা দিয়ে সে কোচবাক্সের ভাড়া গুনেছে, পায়ে হেঁটে যাবে

বলে তো নয়–এখন তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কোচবাক্সের, সে কেন খামকা এই হাওয়ার মধ্যে হেঁটে যাবে!

হঠাৎ সাড়ে-ছটা নাগাদ, হাওয়ার দাপট যখন চরমে পৌঁছেছে, এক বিষণ্ণ ঝাঁকুনি খেলে কোচবাক্স। সামনের একটা চাকা পড়েছিলো ভিজে নরম মাটিতে, ঘোড়াগুলোকে চাবুক কশিয়ে দিতেই তারা এত জোরে চাকাটায় টান দিলে যে চাকাটা শব্দ করে ভেঙে গেলো, আর তক্ষুনি টাল শামলাতে না পেরে কোচবাক্স বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়লো।

কোচয়ান যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো! পায়ে চোট পেয়েছে পোখ, কিন্তু একটাই তার ভাবনা, সেই পেট-মোটা ব্রীফ-কেসটা শামলে রাখার দায়িত্ব তার। একবারও সে ব্রীফ-কেসটাকে হাতছাড়া করেনি–এবার চামড়ার ব্যাগটাকে সজোরে আঁকড়ে বগলদাবা করে সে কোনো রকমে উলটোনো কোচবাক্স থেকে বেরিয়ে এলো।

ব্রোক্স আর অন্য যাত্রীটির গা একটু কেবল ছড়ে গিয়েছে। কোচোয়ানের গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি, লাফিয়ে নেমে সে ঘোড়াগুলোর দিকে ছুটে গেলো। ফাঁকা একটা জায়গা, কেবল বাঁ দিকে কতগুলো গাছ এলোমেলো দাঁড়িয়ে।

কী হবে আমাদের? জিগেশ করলে পোখ।

কোচবাক্সের তো আর যাবার কোনো উপায় নেই, ব্রোক্স তাকে জানালে।

অচেনা যাত্রীটি তবু টু শব্দটিও করলো না।

পেরনাউ অব্দি হেঁটে যেতে পারবে তো? পোখকে জিগেশ করলে ব্রোক্স।

ঐ বারো মাইল! পোখ কাৎরে উঠলো, পায়ে এই চোট লাগার পরেও!

তা হেঁটে না-গেলেও...ঘোড়ার পিঠে?

ঘোড়ার পিঠে!...কয়েক কদম গেলেই তো অক্কা পাবো!

তাহলে কোনো সরাইখানা খুঁজে বার করে তাতে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটানো ছাড়া আর উপায় কী! কিন্তু আশপাশে কোনো সরাই আছে কি না কে জানে! পোখ আর অচেনা যাত্রীটির তাছাড়া আর কিছু করার নেই। ব্রোক্স আর কোচোয়ান না-হয় ঘোড়ায় চড়ে ছুতোরের কাছে যাবে–চাকাটা সারিয়ে নেবার জন্যে মিস্ত্রি ডাকতে।

অতগুলো টাকার দায়িত্ব তার ঘাড়ে না থাকলে এই চমৎকার ব্যবস্থাটা পোখ-এর মনঃপুত হতো সন্দেহ নেই... কিন্তু এই পনেরো হাজার রুবল নিয়ে...

তাছাড়া এ রকম ফাঁকা জায়গায় সরাইখানাই বা কোথায়! সরাই না হোক, কোনো খামার বা মদের দোকান হলেও চলে। কিন্তু রাত কাটাবার উপযোগী কোনো কিছু আছে না কি কাছাকাছি? পোখ-এর প্রথম প্রশ্ন হলো এটাই।

হ্যাঁ... ঐ দিকে কিছু-একটা আছে নিশ্চয়ই! অন্য যাত্রীটি হাত তুলে দেখালে। প্রায় দুশো গজ দূরে, বনের একপাশে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা। অন্ধকারের মধ্যে গাছপালাগুলো

আবছাভাবে জটলা করে আছে যেদিকটায়,তারই এক প্রান্তে। কিন্তু কীসের আলো ওটা? কোনো সরাইখানার লণ্ঠন, না কি কাঠুরেদের উনুন?

কোচোয়ানকে জিগেশ করতেই সে বললে, ওটা ক্রোফের ভাটিখানা।

কেরাফের ভাটিখানা? পোখ জিগেশ করলে।

হ্যাঁ। ”ভাঙা ক্রুশ” নাম।

তাহলে, ব্রোক্স তাদের দিকে ফিরে বললে, তোমরা যদি “ভাঙা ক্রুশে” রাত কাটাতে রাজি থাকো তো সকালে আমরা এসেই তোমাদের তুলে নিতে পারি।

অচেনা যাত্রীটি এই প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করলে না, কারণ এক্ষেত্রে সেটাই হলো মন্দের ভালো ব্যবস্থা। আবহাওয়া ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে, আরেকটু পরেই নিশ্চয়ই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। কনডাকটার আর কোচোয়ানও ঘোড়াগুলো নিয়ে পেরনাউ যেতে মহা মূশকিলে পড়বে।

পোখ-এর জখম হাঁটু বড্ড ব্যথা করছিলো। বাধ্য হয়েই সে প্রস্তাবটায় সায় দিলে, তাহলে তাই হোক। রাত্তিরটা জিরিয়ে নিলে নিশ্চয়ই চোটটা শামলে ওঠা যাবে। আমি কিন্তু তোমারই ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে আছি, ব্রোক্স।

ব্রোক্স তাকে আশ্বস্ত করলে, আমি ঠিক সকালেই এসে হাজির হবো, দেখো।

ঘোড়াগুলো খুলে নেয়া হলো। কারণ কাৎ-হয়ে-পড়ে-থাকা কোচবাক্সটা ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। এই রাতে এ রাস্তায় আর কোনো কোচবাক্স আসবে বলেও মনে হয় না, কাজেই কোচবাক্সটা রাস্তা জুড়ে পড়েই রইলো।

হাতঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে পোখ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ওই ক্ষীণ আলোর রেখা ধরে এগুলো।

কিন্তু খুঁড়িয়েও সে ভালো করে হাঁটতে পারছিলো না দেখে অচেনা যাত্রীটি বললে যে তার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে। সঙ্গীকে যথোচিত ধন্যবাদ দিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পোখ তার সাহায্য নিতে রাজি হলো। আগে লোকটাকে দেখে, বা না-দেখে, যা মনে হয়েছিলো, আসলে হয়তো সে ততটা অসামাজিক নয়।

আর-কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। সরাইখানাটা ছিলো বড়ো রাস্তার উপরেই। দুশো গজ পথ তারা চট করে পেরিয়ে এলো।

সরাইয়ে ঠিক ঢোকবার মুখে একটা প্যারাফিন লণ্ঠন ঝুলছে। দেয়ালের এককোনায় একটা ঢ্যাঙা খুঁটি উঠেছে–দিনের বেলায় যাতে লোকে দূর থেকে দেখতে পায় সাইনবোর্ডটা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা আসছে। গেলাশের শব্দ ও কথাবার্তার টুকরো শুনে বোঝা গেলো যে সরাইটা একেবারে নির্জন নয়। সদর দরজার উপরে ঝুলছে একটা সাইনবোর্ড-লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেলো ত্যাড়াবাঁকা হরফে তাতে লেখা ভাঙা ক্রুশের সরাইখানা।

ভাঙা ক্রুশের সরাইখানা

৫. ভাঙা ক্রুশের সরাইখানা

ভাঙা ক্রুশ নামটা যে যথাযোগ্য এটা প্রমাণ করার জন্যই সরাইখানার বাড়ির গায়ে ষাঁড়ের রক্তে একটা ছবি আঁকা : রুশী ধরনের একটা ডবল ক্রুশ, মাটি থেকে উপড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সন্দেহ নেই অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া কোনো ঘটনার কথাই এটা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছে।

সরাইয়ের মালিক হলো জনৈক ক্রোফ। লোকটা স্লাভ নয়, বিপত্নীক, বয়েস পঁয়তাল্লিশ। রিগা-পেরনাউর বড়ো রাস্তায় এই সরাইটা অনেক দিন ধরে আছে। ক্রোফের আগে তার বাপ এটার দেখাশুনো করতো। আশপাশে দু-তিন ভেস্টের মধ্যে না আছে কোনো ঘর বাড়ি, না আছে কোনো পাড়া-গাঁ; ফলে মনে হয় এই ভাঙা কুশ যেন শূন্য ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

খদ্দের বলতে আছে কেবল কোচবাক্সের যাত্রীরা; কেউ কেউ নিয়মিত আসে, কেউ বা কোচবাক্সে যাবার সময় হঠাৎ একদিন নেমে পড়ে;আর আসে আশপাশের খেত-খামারের কাজ করা জনা দশ-বারো চাষী আর কাঠুরে।

কেমন চলে তার ব্যাবসা? ক্রোফ অবিশ্যি কখনোই প্যানপ্যান করে না, নিজের কথা সাতকাহন করে বলা তার ধাতে নেই। তিরিশ বছরের পুরোনো এই সরাই, আগে চালাতে তার বাপ, চোরাই মালের ব্যাবসা আর এর-ওর বাগান ও বনবাদাড় থেকে এটা

ওটা চুরি করে ব্যাবসা বেশ ফাঁপিয়ে তুলেছিলো। এখন চালাচ্ছে ক্রোফ-চলে তো যাচ্ছে বেশ। তা থেকে চেনা লোকের ধারণা ক্রোফ হচ্ছে টাকার কুমির, কিন্তু পরের ব্যাপারে নাক গলাতে যাবার কী দরকার?

ক্রোফ বিশেষ বাকতাল্লা করে না, হুঁ-হাঁ দিয়েই কাজ চালিয়ে দেয়। থাকে চুপচাপ নিরিবিলিতে, সরাই ছেড়ে বিশেষ বেরোয় না, মাঝে-মাঝে পেরনাউ-এ যায়, না গেলে অবসর সময়ে নিজের বাগানের শাক-শবজির তদারকি করে। ছেলেপুলে নেই, বউটাও মারা গেছে, একা-একা সে করেই বা কী? জোয়ান মানুষ ক্রোফ, লাল মুখো, ঝোঁপের মতো দাড়ি মুখ ভরে, মাথায় কঁকড়া চুল। কখনও অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না, নিজেও কম কথায় জবাব সারে।

বাড়িটা একতলা, ঢোকবার দরজাটা এক পাল্লার, পাল্লা খুললেই একেবারে মদের আড্ডায় গিয়ে পৌঁছনো যায়–কোনায় একটা জানলা আছে, তাই দিয়েই আলো আসে; বাঁয়ে আর ডান দিকে দুটো ঘর, সে-ঘর দুটোর জানলা রাস্তার দিকে খোলা। ক্রোফের ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে, শবজি-বাগানের পাশেই।

সরাইয়ের দরজা-জানলা-খড়খড়ি সব খুব মজবুত আর টেকসই, ভিতর দিক থেকে আটকাতে হয়, খিল আছে, আংটা লাগানো, তার উপর ছিটকিনিও আছে, এদিকটা এমনিতে সরাইওলাদের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়; তাই সন্ধে হতে না হতেই সবাই দরজা-জানলা এঁটে বসে যাবে। ভাঙা কুশ অবিশ্যি এমনিতে দশটা অব্দি খোলা থাকে, ছ-সাতজন মক্কেল বসে শ্নাস আর ভোদকা গেলে খোশ মেজাজে।

ছোট্ট শবজি-বাগান, ঝোঁপের বেড়া দেয়া চারপাশে; শবজিগুলো বেচে ক্রোফের বেশ লাভই হয়। গাছের ফল তো প্রকৃতি-ঠাকরুনের বদান্যতার। উপরেই নির্ভর করে; মাঝারি জাতের চেরি আর আপেল ফলে, আর আছে কিছু জাম আর জামরুল-লিভভানিয়ায় এ সব ফলের ভারি কদর।

সেদিন সন্ধেবেলায় টেবিলে বসে মদের গেলাশে চুমুক দিতে-দিতে আড্ডা দিচ্ছিলো আশপাশের গ্রামের জন সাত-আট চাষী আর কাঠুরে। রোজ বাড়ি ফেরবার আগে স্নাপস-এর টানে এসে তারা এখানে জড়ো হয়–কেউই অবশ্য রাত কাটায় না। যাত্রীরাও কদাচিই রাত কাটাতে চায়, তবে কোচবাক্সের সহিস আর কনডাকটাররা অবিশ্যি পেরনাউ পৌঁছোবার আগে এখানে একবার গলা ভিজিয়ে নিতে ভালোই বাসে।

নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে দুজন ছিলো স্বতন্ত্র, তারা একপাশে বসে সকলের উপর নজর রাখতে-রাখতে নিচু গলায় কথা বলছিলো : তারা হলো পুলিশ-সারজেন্ট য়েক আর তার এক সহকারী। পেরনোস্কায় সেই তাড়া দেয়ার পর তারা একটা উড়ো খবর পেয়ে এ তল্লাটে চলে এসেছে–শুনেছে এখানে নাকি কয়েকটা ষণ্ডা-বাটপাড়ের উপদ্রব হয়েছে, তাই বিভিন্ন টহলদারি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদিকটায় তারা সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছে।

গত অভিযানটার ব্যর্থতায় য়েক তখনও অসন্তুষ্ট বোধ করছিলো। ভেবেছিলো, সেই পলাতককে জ্যান্ত পাকড়ে নিয়ে মেজর ফেরডেরের হাতে তুলে দেবে, কিন্তু পেরনোস্কোর সেই বরফের মধ্যে তার লাশটা অব্দি সে বার করতে পারেনি।

লোকটা অবিশ্যি ডুবে মরেছে বলেই মনে হয়, য়েক তা সঙ্গীকে বোঝালে।

নিশ্চয়ই তা-ই, পুলিশটি সায় দিলে।

নিশ্চয়ই ডুবে মরেছে–এটা অবিশ্যি বলা যায় না, কারণ আমরা তার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাইনি...আর যদি তার জল খেয়ে ঢোল-হওয়া দেহটা খুঁজেও পেতুম, সেই অবস্থায় হতভাগাকে কিছুতেই আবার সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দেয়া যেতো না। না, পাজিটাকে জ্যান্ত গ্রেফতার করা উচিত ছিলো আমাদের। পুরো ব্যাপারটায় পুলিশের ভূমিকা মোটেই তারিফ করবার মতো হয়নি।

পরের বারে আমাদের বরাত খুলবে, সারজেন্ট, বেশ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে অন্য পুলিশটি।

সারজেন্ট য়েক তা শুনে বেশ বিরক্তভাবেই মাথা নাড়লে–ও-সব দার্শনিকতায় তার মন ভেজে না।

হঠাৎ বাইরে ঝড় ভীষণভাবে গর্জে উঠলো। সদর দরজা এমনি ভাবে নড়ে উঠলো যে মনে হলো এক্ষুনি বুঝি কজা ভেঙে পুরো পাল্লাটাই দুম করে খশে পড়বে। মস্ত চুল্লিটা হাওয়ার ঝাঁপটায় একেকবার নিভে আসছে আবার পরক্ষণেই দপ করে জ্বলে উঠছে। আশপাশের গাছপালার ডালে মড়মড় শব্দ হচ্ছে, সরাইখানার ছাদে ভাঙা ডালগুলো আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

কেবল কাঠুরেদের সুবিধের জন্যই এ-রকম ঝড় হয়, একজন চাষী বিজ্ঞ মন্তব্য করলে, তাদের আর কী–কেবল ভাঙা কাঠকুটো কুড়িয়ে নিলেই হলো।

চোর-বাটপাড়দেরও ফুর্তির সময় সন্দেহ নেই, পুলিশটি বললে।

তা ঠিক বলেছো, য়েক সায় দিলে, কিন্তু তাই বলে তাদের ছেড়ে দিলে তো চলবে না... আমরা তো জানি একটা মস্ত ডাকাতদল দেশটা ছারখারে দিচ্ছে–এই তো টারফারটে চুরি হয়েছে সেদিন, আর কারকুসে একটা লোক একটু হলেই খুন হয়ে যাচ্ছিলো। তাছাড়া রিগা-পেরনাউর রাস্তাও আজকাল মোটেই নিরাপদ নয়। একটার পর একটা খুন-জখম-রাহাজানির খবর আসছে, অথচ কাউকেই এখন অব্দি পাকড়ানো যায়নি। আর পাকড়াতে পারলেই বা ষণ্ডাগুলোর কী হবে–সাইবেরিয়ায় গিয়ে কেবল মাটি কোপাবে। তাতে তাদের ভারি বয়ে যায়। যদি ফাঁসিতে ঝুলতে হতো, তাহলে একটা কাজ করার আগে পাজিগুলো দু-বার করে ভাবতো।

কী করে যে লোকে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেবার কথা বলে, এটা তার একেবারেই অনধিগম্য। এটা ঠিক যে রাজনৈতিক কারণে এখনো কাউকে কাউকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু সাধারণ চুরি বাটপাড়ি রাহাজানির জন্যে কাউকেই আজকাল আর ফাঁসিতে ঝুলতে হয় না। এটা যে রেক-এর কত বড়ো দুঃখ, তা সে কাকে বোঝাবে?

যাক্ গে, এবার আমাদের রওনা হয়ে পড়া উচিত, য়েক উঠে পড়ার জন্যে তাড়া দিলে, পেরনাউতে ফিফথ স্কোয়াডের সারজেন্টের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে, বলে সে টেবিল চাপড়ালে।

ক্রোফ চটপট তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে।

কত হয়েছে, ক্রোফ? সারজেন্ট তার পকেট থেকে কিছু খুচরো বার করলে।

কত হয়েছে তা তো আপনি জানেনই সারজেন্ট, সরাইওলা বললে, আমার এখানে সকলের জন্যেই একদর...

এমনকী তাদের জন্যেও একদর, যারা জানে তোমার এখানে এলে তুমি তাদের কাগজপত্তর দেখতে চাইবে না বা এমনকী নামটাও জানতে চাইবে না?

আমি তো আর পুলিশ নই, সোজাসুজি বললে ক্রোফ।

কিন্তু সব সরাইওলা যদি তা করতো তাহলে দেশে খুন-জখমের সংখ্যা অনেক বেড়ে যেতো। দেখো, একদিন যেন এজন্য তোমাকে পাততাড়ি গোটাতে না হয়।

ফেলো কড়ি ভরো গেলাশ, এই হলো আমার নীতি, সরাইওলা বললে, কে কোত্থেকে এসেছে, আর কে কোথায় যেতে চাচ্ছে–তা জানবার আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

ওহে ক্রোফ, আমার কাছে কালা-বোবা সাজার চেষ্টা কোরো না। তুমি ঠিকই জানো, আমি কী বলতে চাচ্ছি। এখনও সাবধান হও, না-হলে একদিন কিন্তু ভীষণ পস্তাতে হবে। আচ্ছা, চলি।

সারজেন্ট য়েক উঠে দাঁড়িয়ে সব দাম চুকিয়ে দিলে, তারপর তার সঙ্গীকে নিয়ে দরজার দিকে এগুলো। অন্য খদ্দেররাও উঠে দাঁড়ালে এক-এক করে–এই বিচ্ছিরি আবহাওয়ায় চটপট বেরিয়ে না পড়লে পরে মুশকিলে পড়তে হবে।

ঠিক সেই সময়ে সশব্দে দরজাটা খুলে গেলো...পরক্ষণেই আবার পাল্লাটা হাওয়ার ঝাঁপটায় বন্ধ হয়ে গেলো।

ঘরে ঢুকেছে দুটি লোক–একজন খোঁড়াচ্ছে, সে অন্যজনের কাঁধে ভর দিয়ে আছে। লোক দুটি আর কেউ নয়, পোখ আর তার সহযাত্রী। আগের মতোই অচেনা যাত্রীটির গা ওভারকোটে মোড়া, টুপিটা একেবারে ভুরু পর্যন্ত নামানেনা বলে তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সরাইওলার সঙ্গে কথা বললো কিন্তু সে-ই : প্রায় দুশো গজ দূরে আমাদের কোচবাক্সটা ভেঙে পড়েছে। কোচোয়ান আর কনডাকটার সহিসদের নিয়ে পেরনাউ গেছে–সকালে ফিরে এসে তারা আমাদের খোঁজ করবে। রাত্তিরটা কাটাবার মতো দুটো ঘর পাওয়া যাবে কি?

হ্যাঁ, ক্রোফ জানালে।

আমি একটা ঘর নেবো, পোখ বললে, আর যদি ভালো একটা বিছানা থাকে–

পাবেন, ক্রোফ তাকে আশ্বস্ত করলে, চোট লেগেছে না কি?

পা-টা ছড়ে গেছে, তবে তেমন লাগেনি, বললে পোখ।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আমি অন্য ঘরটা নেবো, যাত্রীটি বললে।

য়েক-এর মনে হলো গলাটা তার খুবই চেনা। যার গলা বলে মনে হলো, তাকে এখানে দেখতে পাবে বলে সে আশা করেনি। তবে পুলিশ হিশেবে তার কর্তব্য একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে নেয়া। কেন যেন তার মনে হলো, এটা জানা তার খুবই জরুরি। ইতিমধ্যে পোখ একটা চেয়ারে বসে পড়ে পাশের টেবিলে তার ব্রীফ-কেসটা রেখেছে– সেটা তখনো একটা শেকল দিয়ে তার কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা।

ঘর পাওয়া যাবে...উত্তম প্রস্তাব, বললে পোখ, কিন্তু পা ছড়ে গেলেও বেশ খিদে পায়– আমি কিছু খাদ্যও চাই।

তাও পাবেন, ক্রোফ তাকে আশ্বস্ত করলে।

তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারেন, দেখুন, পোখ জানালে।

সারজেন্ট য়েক গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো। ভাগ্যি ভালো, হের পোখ যে! আপনার বেশি লাগেনি...

আরে! পোখ খুশিই হলো : সারজেন্ট য়েক! আপনি!

হ্যাঁ, আমি। বেশি জখম হননি তো?

না। মনে হয় না কাল কোনো ব্যথা থাকবে!

ক্রোফ এসে রুটি, ঠাণ্ডা বেকন আর চায়ের পেয়ালা সাজিয়ে দিলে। তারপর অন্য যাত্রীটিকে জিগেশ করলে, আপনিও খাবেন নাকি?

না, আমার খিদে পায়নি, যাত্রীটি জানালে, আমাকে বরং আমার ঘরটা দেখিয়ে দিন...এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত, কারণ হয়তো কাল কনডাকটাররা ফিরে আসার আগেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি তোর চারটেয় বেরিয়ে পড়তে চাই।

আপনি যা বলবেন,বললে সরাইওলা। পানশালার বাঁ দিকের ঘরটার দিকে সে যাত্রীটিকে নিয়ে গেলো–ডান দিকের ঘরটা রইলো পোখ-এর জন্য।

কিন্তু যাত্রীটি যখন কথা বলছিলো, তখন তার মাথার টুপিটা একদিকে একটু সরে যায়। সারজেন্ট য়েক সারাক্ষণই তার উপর নজর রাখছিলো, যতটুকু দেখতে পেলে, তাই যথেষ্ট। হুম!... ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম।...কিন্তু অত সকালে কোচবাক্স ছাড়াই চলে যেতে চাচ্ছে কেন! অত তাড়া কীসের? সত্যি, পুলিশের চোখে অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিশও অনেক সময় অদ্ভুত বলে ঠেকে। আর তাছাড়া যেতেই বা চাচ্ছে কোথায়? কথাগুলো নিজেকেই জিগেশ করছিলে য়েক; কারণ তার মনে হচ্ছিল জিগেশ করলে হয়তো যাত্রীটি তাকে সব কথা নাও বলতে পারে। আর সারজেন্ট যে তাকে খুব মনোযোগ দিয়ে। দেখছিলো, এটা যাত্রীটির যেন চোখেই পড়েনি। সে ক্রোফের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পোখ তখন গোগ্রাসে রুটি বেকন গিলছিলো, য়েক গিয়ে তার কাছে দাঁড়ালো।

ওই যাত্রীটি কি আপনার সঙ্গে কোচবাক্সে করে এলা? য়েক জিগেশ করলে।

হুঁ। বললে পোখ, সারা রাস্তায় তার কাছ থেকে চারটে কথাও বার করতে পেরেছি কি না সন্দেহ।

কোথায় যাচ্ছে, তা জানেন?

না...রিগায় উঠেছিলো, সম্ভবত রেফেল অব্দি যাবে। ব্রোক্স থাকলে সব ঠিক বলতে পারতো।

না না, আমি এমনি জিগেশ করছিলুম।

ক্রোফ অবিশ্যি সব কথাই শুনছিলো, কিন্তু এ-সব কথায় তার কিছু এসে যাচ্ছিলো বলে মনে হচ্ছিলো না। চাষী আর কাঠুরেরা একজন-একজন করে চলে যেতে লাগলো। ক্রোফ সব গোছগাছ করায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। য়েক. এর এখন আর অবিশ্যি খুব তাড়া দেখা গেলো না, সে বেশ চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে পোখ-এর সঙ্গে। পোখও চেনা লোক দেখে খুব খুশি। কথা কইতে না পারলে তার পেট ফেঁপে যায়, খাবার হজম হয় না।

আপনি বুঝি পেরনাউ যাচ্ছেন? য়েক জিগেশ করলে।

না–আমিও রেফেলই যাচ্ছি, সারজেন্ট য়েক।

হের ইয়োহাউজেন-এর কাজে?

হ্যাঁ, বলে নিজের অজান্তেই পোখ তার ব্রীফ কেসের উপর হাত বুলিয়ে নিলে।

অ্যাক্সিডেন্টটায় তো অন্তত বারো ঘণ্টা দেরি হয়ে গেলো!

সকালবেলায় যদি ব্রোক্স ঠিকঠাক এসে পৌঁছোয়, তাহলে অবিশ্যি চারদিনের মধ্যেই রিগায় ফিরতে পারবো... বিয়ের সময়...

ভজেনাইদা পারেনসোফ-এর সঙ্গে... হ্যাঁ, আমি জানি...

আপনি তো সবই জানেন!

কই আর জানি? আমি কি জানি আপনার সঙ্গী কোথায় যাবেন? অত সকালে যখন ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়ছেন, তখন নিশ্চয়ই পেরনাউতে একবার থামবেন...

হ্যাঁ, তা সম্ভব। বললে পোখ, আর হয়তো তার সঙ্গে কখনো দেখাই হবে ।...তা হের য়েক আপনিও কি এই সরাইতে রাত কাটাচ্ছেন নাকি?"

না, হের পোখ। পেরনাউতে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। ...তা খাওয়াদাওয়ার পর ভালো করে ঘুমিয়ে নেবেন, দেখবেন শরীরটা ঝরঝরে লাগবে...আর ওই ব্রীফ-কেসটা যেন চোখের আড়ালে করবেন না।

পোখ হাসলো, মাথার সঙ্গে যেমন কান থাকে, তেমনি ওটাও আমার কাছে। থাকবে।

চলো, সঙ্গীকে বললে য়েক, ভালো করে বোতাম এঁটে নাও, নইলে হাড়ের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা লাগবে।...শুভরাত্রি, হের লোখ!

শুভরাত্রি, সারজেন্ট য়েক!

সারজেন্ট য়েক আর তার সঙ্গী দরজ খুলে বাইরে ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে গেলো। ক্রোফ প্রথমে পাল্লাটা আটকে খিল তুলে দিলে, তারপর মস্ত একটা তালা ঝুলিয়ে চাবি লাগালে। এই রাত্তিরে ভাঙা ক্রুশে আর-কেউ আসবে বলে মনে হয় না। কোচবাক্স না-ভেঙে গেলে এই দুই যাত্রীও এখানে আশ্রয় নিতো কিনা সন্দেহ।

ততক্ষণে পোখ-এর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পেটে দানাপানি পড়তেই বেশ চাঙ্গা লাগছে–এবার বিছানায় একটু গড়িয়ে নিলেই, বাস, আজকের মতো ঝক্কি-ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে।

ক্রোফ তার গনগনে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলো, পোখ কখন তার ঘরে যায়। মাঝে-মাঝে হাওয়ার ঝাঁপটায় আগুনের শিখা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ঢুকে পড়ছে। টেবিলের উপর মোমবাতির আলোগুলো কাঁপছে, দেয়ালে ছায়াগুলো নেচে উঠছে, বাইরে হাওয়া এত জোরে বইছে যে মনে হচ্ছে কে যেন দরজা-জানালায় একটানা ধাক্কা দিচ্ছে।

শুনলেন?হঠাৎ দরজাটা এত জোরে কেঁপে উঠলো যে পোখ জিগেস করে বসলো।

কেউ না।... ও হাওয়া, সরাইওলা বলল, কেউ না...ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে...এবার শীতে প্রায়ই তো আবহাওয়া খারাপ যাচ্ছে।

অবিশ্যি আজ রাত্তিরে পথে-ঘাটে কেউ আছে বলে মনে হয় না–কেবল চোর-পুলিশের কথা আলাদা।

হাঁ। এই আবহাওয়ায় কে আর বেরুবে?

পোখ উঠে দাঁড়ালো নটা নাগাদ, ব্রীফ-কেসটা বগলদাবা করে ক্রোফের দেয়া একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ক্রোফের হাতে একটা পুরু কাঁচ বসানো লণ্ঠন। পোখ দরজা বন্ধ করতে করতে জিগেশ করলে, আপনি শুতে যাবেন না?

যাবো, ক্রোফ বললে, তবে একবার চারদিক দেখেশুনে নিচ্ছি। রোজই শুতে যাবার আগে চারদিক দেখে নিই। তাছাড়া উঠোনে মুরগির খাঁচা আছে-মুরগিরা সব খাঁচায় ঢুকেছে কিনা দেখা উচিত। মাঝে-মাঝে সকালে একটা-দুটোর পাত্তা মেলে না।

ও, পোখ জিগেশ করলে, খ্যাকশেয়াল?

হ্যাঁ, শেয়াল আছে–নেকড়ে আছে। নেকড়েগুলো মহা বদমাশ, বেড়া ডিঙিয়ে চলে আসে। তবে আমার জানলা থেকে উঠোনটা দেখা যায় কিনা, নেকড়ে দেখলেই গরম শিশে ছুঁড়ে মারি...রাত্তিরে বন্দুকের আওয়াজ শুনলে তাই ঘাবড়ে যাবেন না যেন।

ওঃ, পোখ উত্তর দিলে, একবার ঘুমোলে আমাকে জাগাতে কামান দাগতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার অবিশ্যি যাবার খুব তাড়া নেই। আমার সঙ্গী যদি বিচানা ছাড়তে চায়

তো সে তার ইচ্ছে। ব্রোক্স পেরনাউ থেকে ফিরে কোচবাক্স মেরামত করবার পর আমাকে ডাকলেই চলবে।

ঠিক আছে, সরাইওলা তাকে আশ্বস্ত করলে, আপনাকে কেউ জাগাবে না। যাত্রীটি যাবার সময় আপনি যাতে উত্ত্যক্ত না-হন, আমি তা লক্ষ রাখবো।

হাই চেপে পোখ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দিলে।

মস্ত ঘরটায় ক্রোফই রইলো একা। আবছা আলো জ্বলছে লণ্ঠনের। পোখ-এর টেবিলটা সাফ করে সে ছোটোহাজারি সাজিয়ে রাখলে। বেশ গোছানে তোক ক্রোফ, কোনো কাজই পরদিনের জন্য তুলে রাখা পছন্দ করে না। কাজকর্ম শেষ করে সে উঠোনের দিকের দরজাটা গিয়ে খুললো। সেটা উত্তর-পশ্চিম দিক, ঝড়ের দাপট সেদিকটায় একটু কম, হয়তো বাড়িটার কাঠামো একটু বাঁচিয়েছে। কিন্তু বেড়ার ওপাশে কনকনে হাওয়া সমানে। গর্জাচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় তার আর বেরুতে ইচ্ছে করলো না। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই সে চারপাশটা দেখে নিলে। না, উঠোনে সন্দেহজনক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ছায়ার মতো নিঃশব্দে কোনো নেকড়ে বা শেয়াল এসে হাজির হয়নি। লণ্ঠনটা নাড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে সে আবার দরজাটা লাগিয়ে দিলে। এই ঠাণ্ডায় উনুনটাকে নিভতে দেওয়া ঠিক হবে না। কয়েকটা কাঠকুটো গুঁজে দিলে সে চুল্লিতে। চারপাশটা দেখে নিয়ে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

তার ঘরটা বাগানের একেবারে লাগোয়া। পাশে বারান্দা আছে–বারান্দার ওপাশে পোখ-এর ঘর। পোখ এতক্ষণে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্রোফ লণ্ঠন হাতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

দু-তিন মিনিট পরে খশখশে শব্দ শুনে বোঝা গেলো জামাকাপড় ছেড়ে সে রাতকাপড় পরে নিচ্ছে–তারপরে অপেক্ষাকৃত জোরালো আওয়াজ শুনে বোঝা গেলো সে তার বিছানায় উঠে পড়লো।

ঘুমন্ত সরাইটাকে ঘিরে ক্ষুধার্ত হাওয়া গর্জাতে লাগালো সারারাত; হাওয়া আর বৃষ্টি আর ঝড়ের গোঙানি-পাতা-ঝরা পাইনগাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে একটানা বয়ে যেতে লাগলো।

ক্রোফ উঠে পড়লো চারটের একটু আগেই। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে বড়ো ঘরটায় হাজির হয়ে দ্যাখে যে রহস্যময় যাত্রীটির ঘরের দরজাও ঠিক তক্ষুনি খুলে গেছে। সারা গায়ে ওভারকোট চাপানো কালকের মতো, টুপিটাও চোখ অব্দি এমনভাবে নামানো যে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

এক্ষুনি যাবেন? ক্রোফ জিগেশ করলে। হু।, বলে যাত্রীটি পকেট থেকে দু-তিনটে কাগজের রুবল বার করলে, রাতের জন্য কত ঘরভাড়া দেবো?

এক রুবল।

এই নিন।...দরজাটা খুলে দিন, বেরিয়ে পড়ি।

দিচ্ছি। লণ্ঠনের আলোয় নোটটা উলটে-পালটে দেখে ক্রোফ চাবি বার করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। জিগেশ করলে, যাবার আগে কিছু চাই নাকি?

না। ভোদকা? বা একফোঁটা স্নাপস।

না। আমার একটু তাড়া আছে। দরজা খুলে দিন।

তা আপনি যদি বলেন...

ক্রোফ খিল নামিয়ে তালা খুলে দিলে।

বাইরে তখনও অন্ধকার। বৃষ্টি ধরে এসেছে, তবে তখনও ঝোড়ো হাওয়া গর্জাচ্ছে অবিরাম-রাস্তায় অজস্র ভাঙা ডালপালা পড়ে আছে।

টুপিটা আরো নামিয়ে চিবুকছুই যেন ঢেকে ফেললে যাত্রীটি, তারপর ওভারকোটের বোতাম আঁটতে-আঁটতে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। ক্রোফ দরজাটা এঁটে আবার খিল তুলে দিলে।

.

৬. হুলুস্থূল

ট্রাঙ্কেল–ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন-এর সে খাশ বেয়ারা–গিয়েছিলো থানায় পঁচিশ ঘা বেত খাবে বলে। ইয়োহাউজেনরা প্রায় সমরবাহিনীর মতো সময়নিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী। রোজ সকাল নটায় রুটি-মাখন সহযোগে সে-বাড়িতে চায়ের আসর বসে। কিন্তু সেদিন ট্রাঙ্কেলের গাফিলতির জন্যই নটার সময় স্যামোভার কাজ করছিলো না। কর্তামশায়ের কাছে কোনো ওজর-ওজুহাত চলে না। তিনি চটপট একটা চিরকুট লিখে ট্রাঙ্গেলকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন; চিরকুটটায় লেখা ছিলো, আমার বেয়ারা ট্রাঙ্কেল কাজের গাফিলতির জন্যে পঁচিশ ঘা বেত খাবে–ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন। বেত খেতে যাবার আগে ফ্রাঙ্ক তার খাশ বেয়ারাকে মনে করিয়ে দিলেন, সে যেন থানা থেকে লিখিয়ে আনে বেত্রাঘাতের জন্য কত মজুরি চাই। যে-লোকটা বেত মারবে সে এই বাবদ সব সময়েই ইয়োহাউজেনদের কাছ থেকে মজুরি পায়–বিনি পয়সায় তিনি কাউকেই খাটান না।

খুব যে হুড়মুড় করে থানায় যাবার ইচ্ছে ছিলো ট্রাঙ্কেলের, তা নয়। তবে সে রাস্তায় আর ঢিমে তেতালায় হাঁটলে না। কী জানি, খুব-একটা দেরি হলে যদি আরেক শাস্তি জোটে। তবে যাবার আগে বেতের ঘা শামলাবার জন্যভোদকা-সহযোগে একটু চা গিলে নিলে। তারপর সাহসে পিঠ বেঁধে থানার রাস্তা ধরলো সে।

থানায় তার ভারি খাতির। যেন পুরোনো বন্ধু। হাত-ঝাঁকুনি, স্বাস্থ্য-কামনা ইত্যাদি সব হলো।

একটি পুলিশ বললে, এই যে, ট্রাঙ্কেল! বেশ অনেক দিন পরে দেখা হলো–প্রায় মাসখানেক তো হবেই।

না, অতদিন হবে না।

তা কে পাঠালেন তোমাকে, শুনি?

স্বয়ং কর্তামশাই –হের ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন।

হুম... মেজর ফেরডেরের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাই না?

যদি তিনি দয়া করে দেখা করেন।

এইমাত্র আপিশে এসেছেন মেজর। তোমাকে দেখলে উনি খুশিই হবেন।

এ-কথা শুনে ট্রাঙ্কেল সোজা গিয়ে মেজর ফেরডেরের কামরার দরজায় আস্তে টোকা দিলে। অমনি ভিতর থেকে ভারিক্কি চালে ঢুকে পড়বার নির্দেশ এলো।

মেজর তার চেয়ারে বসে-বসে এক বাণ্ডিল কাগজপত্তর উলটে-পালটে দেখছিলেন। ট্রাঙ্কেল ঘরে ঢুকতেই তাকিয়ে বললে, ও, তুমি ট্রাঙ্কেল!

আজ্ঞে হ্যাঁ, হের মেজর।

তুমি এসেছো এখানে?

আজ্ঞে, হের ইয়োহাউজেন পাঠিয়েছেন।

ভীষণ-কিছু ব্যাপারে নাকি?

আজ্ঞে যত নষ্টের গোড়া ঐ স্যামোভার! সকালবেলা সময়মত টগবগ করছিলো না।

কেন? তুমি বুঝি জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলে? মেজর হাসলেন।

আজ্ঞে ...

তা ক ঘা, শুনি?

এই যে, কর্তামশাই লিখে দিয়েছেন। ট্রাঙ্কেল হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা এগিয়ে ধরলো।

মেজর কাগজটা পড়ে বললেন, ও, মার এই কটা! তা বেশি নয়।

ট্রাঙ্কেল একবার আর্তনাদ করে উঠলো।

মাত্তর পঁচিশ ঘা।

এক-আধ ডজন বেতের ঘা পেলেও ট্রাঙ্কেল এবার কোনোরকমে শামলে নিতে পারতো। পঁচিশ ঘা জানলে আরো-কিছু ভোদকা গলায় ঢেলে আসা যেতো।

তা তোমাকে আর খামকা দেরি করিয়ে দেবো না। চটপট ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বলে তিনি হাঁক পাড়লেন।

একটা লোক এসে গোড়ালি ঠুকে খাড়া হয়ে তাঁকে সেলাম জানালে। পঁচিশ ঘা বেত, মেজর হুকুম গিলেন, খুব জোরে মেরো না কিন্তু ... এ কেবল বন্ধুর পিঠে পড়বে। স্লভ হলে অবিশ্যি অন্য কথা ছিলো।... যাও ট্রাঙ্কেল, জামা খুলে গিয়ে ইনাম নাও। যখন ফিরে যাবার মতো অবস্থা হবে, এসে রশিদ নিয়ে যেয়ো।

হের মেজরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাঙ্কেল কাঁপতে-কাঁপতে পুলিশের লোকটাকে অনুসরণ করলে। ভাগ্যিশ জার্মানরা ভৃত্যদের পারিবারিক বন্ধু বলে ভাবে, তাই তার আর নালিশ করার মতো কিছু নেই। কামিজ খুলে পিছন ফিরে পিঠ বাঁকিয়ে দাঁড়ালো সে, আর পুলিশের লোকটা বেত তুললো। ঠিক এমন সময়ে থানায় হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেলো।

হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক ঢুকলো, হাঁফাতে-হাঁফাতে সে চেঁচালে, মেজর ফেরডের! মেজর ফেরডের!

বেতটা আর ট্রাঙ্কেলের পিঠ পড়লো না, কারণ কী ব্যাপার জানবার জন্যে পুলিশের লোকটা তখন দরজা খুলে তাকাচ্ছে। ট্রাঙ্কেলও মুখ বাড়িয়ে সব দেখবার চেষ্টা করলে।

শোরগোল শুনে মেজর ফেরডের তখন তার কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কী ব্যাপার?

হন্তদন্ত লোকটা হাঁফাতে-হাঁফাতে তার কাছে গিয়ে একটা তারবার্তা তুলে দিলে। বললে, সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে! ভীষণ অপরাধ!

কখন?

কাল রাতে।

কী হয়েছে?

খুন!

খুন? কোথায়?

পেরনাউ-এর রাস্তায়। ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায়।

কে খুন হয়েছে?

ব্যাঙ্কের কেরানি–ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কের কেরানি!

অ্যাঁ!...পোখ!ট্রাঙ্কেল চেঁচিয়ে উঠলো, আমাদের পোখ!

খুনের কারণ কিছু জানা গেছে? কোনো মোটিভ? মেজর ফেরডের জিগেশ করলেন।

চুরি– কারণ পোখ-এর ব্রীফ-কেসটা পাওয়া গেছে ... মৃতদেহের পাশেই পড়ে ছিলো- ভিতরে কিছু পাওয়া যায়নি।

ভিতরে কী ছিলো বলে অনুমান করছে?

এখনো জানা যায়নি ব্রীফ-কেসে কী ছিলো। তবে ব্যাঙ্কে খবর নিলেই তা এক্ষুনি জানা যাবে।

তারবার্তায় সত্যি এর বেশি কিছু জ্ঞাতব্য ছিলো না। মেজর ফেরডের তার অনুচরদের একজনকে বললেন, তুমি ... তুমি গিয়ে জজ কেরস্টোফকে খবর দাও...

এক্ষুনি যাচ্ছি।

আর তুমি গিয়ে ডাক্তার হামিনেকে বলে এসো। বলল যে এক্ষুনি যেন দুজনে ইয়োহাউজেনদের ব্যাঙ্কে চলে আসেন। ওঁদের অপেক্ষায় আমি সেখানে বসে থাকবো।

হন্তদন্ত হয়ে তোক দুটি থানা থেকে বেরিয়ে পড়লো। মেজর ফেরডেরও ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লেন। আর তালেগোলে ট্রাঙ্কেল বড়ো বাঁচা বেঁচে গেলো। এই হুলুস্থুলুর মধ্যে কেউ খেয়ালই করলে না যে তার পিঠে পঁচিশ ঘা বেত পড়েনি।

সরেজমিন তদন্ত

৭. সরেজমিন তদন্ত

দু-ঘণ্টা পরে দেখা গেলো খটাখট আওয়াজ তুলে পেরনাউ রোড ধরে একটা কোচবাক্স ছুটে যাচ্ছে; ঘোড়ার গাড়িটা আসলে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের; রাস্তার সব কটা আস্তাবলের সঙ্গে ইয়োহাউজেনদের দহরম-মহরম আছে- একেক জায়গায় পৌঁছে ক্লান্ত ঘোড়ার বদলে তেজি ঘোড়া জুতে দিতে তাই আর মোটেই দেরি হয় না; কিন্তু যত জোরেই গাড়ি ছুটুক, রাত্তিরের আগে ওই ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় গিয়ে পৌঁছনো অসম্ভব; সেক্ষেত্রে একটা কোনো আস্তাবলের লাগোয়া বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে সকালে গিয়েই ওই সরাইখানায় পৌঁছনো ভালো।

কোচবাক্সে বসেছিলেন ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন স্বয়ং–আর ছিলেন মেজর ফেরডের, ডাক্তার হামিনে, বিচারপতি কেরস্টোফ–কেরস্টোফই হচ্ছেন তদন্তকারী বিচারক, আর আছে আদালতের এক কেরানি ও দুটি সাধারণ পুলিশ।

বিচারপতি কেরস্টোফের বয়েস পঞ্চাশ হবে; সহযোগীরা ও জনসাধারণ– সকলেই তাঁর নৈপুণ্য ও কর্মক্ষমতায় অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান। কোনো উৎকোচ নেন না বা কর্তৃপক্ষের চাপে বা প্রভাবে টলেন না, কোনো রাজনৈতিক মতবাদের পক্ষপাতী হয়েও বিচারকের কর্তব্য থেকে তিনি কখনো ভ্রষ্ট হন না। বলা যায়, তিনি মনুষ্যবেশী ন্যায়বিচার। চাপা মানুষ, কিছুতেই মুখ খোলেন না।–অর্থাৎ ভাবেন বেশি, বাজে বকেন কম।

ডাক্তার হামিনে যাচ্ছেন পোখ-এর মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। ময়নাতদন্তের আগে মৃত্যুর কারণ ও সময় ইত্যাদি তিনি অনুমান করবেন। আগের দিন সন্ধেবেলায় রোজকার মতোই তিনি গিয়েছিলেন অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শোনেন অধ্যাপক বাড়ি নেই। ইলকার কাছ থেকে শুনেছেন যে তার বাবা কোথায় যেন গেছেন- সেদিনই সকালে নাকি অধ্যাপক মেয়েকে জানিয়েছিলেন যে দু-তিনদিনের জন্য তিনি রিগা ছেড়ে যাচ্ছেন। কোথায় গেছেন, তা ইলকা জানে না। হঠাৎ কেন কোথাও যাবার তাড়া পড়লো, তা মোটেই বোঝা গেলো না। তবে তারও আগের দিন সন্ধেবেলায় তাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমনা দেখাচ্ছিলো। তবে তাঁর মতো ভারিক্কি মানুষকে এই দুশ্চিন্তার কারণ জিগেশ করবে কে? এখন এই চলন্ত গাড়িতে বসে হঠাৎ অধ্যাপক নিকোলেফের কথা ভেবে ডাক্তার হামিনের বেশ উদ্বেগ হলো।

গাড়ি খুব জোরেই ছুটছে। ঘণ্টা তিনেক আগে বেরুতে পারলে আজকেই তদন্ত শুরু করা যেতো। হাওয়া শুকনো, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা, আগের রাত্তিরের সেই বিষম দুর্যোগের কোনো চিহ্ন অবিশ্যি এখন আর নেই। তবে রাস্তার যা জীর্ণ দশা, তাতে ঘোড়াগুলোর উপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে যা হোক।

সবাই চুপচাপ বসে যে যার ভাবনায় তন্ময়–কেবল মেজর ফেরডের আর ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের মধ্যে মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো বিষয়ে বাণী বিনিময় হচ্ছে। কাল সকালে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় পৌঁছে কী শোচনীয় হত্যা-রহস্যের মুখোমুখি হবেন, কে জানে!

+

কোচোয়ান, সহিস আর একটা খামারের গাড়ি নিয়ে যথাসময়ে এসেই সরাইখানায় হাজির হয়েছিলো ব্রোক্স, ভেবেছিলো পোখ ও অন্য যাত্রীটি নিশ্চয়ই তখনও কোচবাক্সের মেরামতের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু হাসিখুশি পোখ-এর বদলে তার মৃতদেহ দেখে ব্রোক্সের অবস্থা যে কী-রকম কাহিল ও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, সেটা সহজেই বোঝা যায়। বেচারি বিয়ে করবার জন্য রিগায় ফিরবে বলে কীরকম উগ্রীব হয়েছিলো, কিন্তু তার বদলে কি না এই! তক্ষুনি সহিস কোচোয়ান সব্বাইকে ফেলে রেখে একটা ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে পড়ে ব্রোক্স সোজা চলে যায় পেরনাউতে, পুলিশকে খবর দিতে। পেরনাউ থেকে, খবরটা শোনবামাত্র, তারবার্তায় সব জানানো হয় মেজর ফেরডেরকে, আর কয়েকজন পুলিশ ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় এসে হাজির হয়। ব্রোক্সও কালবিলম্ব না করে ফিরে আসে, কারণ তদন্তকারীরা নিশ্চয়ই তারও এজাহার চাইবে।

১৫ই এপ্রিল অর্থাৎ পরদিন-সকালবেলায় মেজর ফেরডেরদের নিয়ে কোচবাক্স এসে অকুস্থলে পৌঁছনো মাত্র তদন্তের কাজ শুরু হয়ে গেলো। সরাইখানার বাইরে রাস্তার উপরে কড়া পুলিশ পাহারা বসেছে, রান্নাঘরের ওদিকটাতে ঠিক পাইন জঙ্গলের মুখটাতে পুলিশ রয়েছে তাদের উপর আদেশ আছে কাউকেই যেন সরাইখানায় ঢুকতে দেয়া না-হয়। কৌতূহলী চাষী ও কাঠুরেরা চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পুলিশের জন্য ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। এ তল্লাটে রাস্তাঘাটে খুনজখম রাহাজানি হয় সত্যি, কিন্তু কোনো সরাইখানায় এ-রকম কোনো হত্যাকাণ্ড সচরাচর ঘটে না।

ক্রোফ দাঁড়িয়েছিলো দরজার কাছেই; মেজর ফেরডেররা পৌঁছুতেই সে তাদের প্রথমেই পোখ-এর মৃতদেহ যে ঘরটায় পড়েছিলো সে-ঘরে নিয়ে গেলো।

মৃতদেহটা দেখেই হের ইয়োহাউজেন আর শোক সংবরণ করতে পারলেন না। হ্যাঁ, পোখই বটে, চব্বিশ ঘণ্টা আগে হিম মৃত্যু তাকে স্পর্শ করেছে, এখন মৃতদেহটা পড়ে আছে শক্ত ও ঠাণ্ডা। ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেছে পোখ, ঘুমের মধ্যেই চোট পেয়েছে। পোখ-এর নির্দেশমতো ক্রোফ তাকে সেদিন সকালবেলায় জাগাতে আসেনি– যখন ব্রোক্স সব সাহায্য নিয়ে এসে হাজির হলো তখনই ব্রোক্সকে সঙ্গে করে এসে সে দরজায় কড়া নাড়ে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিলো। অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও কোনো সাড়া না-পেয়ে দুজনেই খুব শঙ্কিত হয়ে উঠে শেষকালে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখনও মৃতদেহটি উষ্ণ ছিলো।

বিছানার পাশেই টেবিলটায় পড়ে আছে পোখ-এর ব্রীফ-কেস, উপরে ব্যাঙ্কের নামের আদ্যক্ষর লেখা; ব্রীফ কেসের শেকলটা মেঝেয় লুটোচ্ছে ভিতরে একটা কানাকড়িও নেই।

প্রথমেই ডাক্তার হামিনে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে বিছানা রক্তে মাখামাখি, এমনকী মেঝেতেও রক্তের ফোঁটা পড়েছে। পোখ-এর পঞ্চম পাঁজরের কাছে, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে, একটা জখমের চিহ্ন পাঁচ-ছ ইঞ্চি লম্বা কোনো ধারালো ছোরা ব্যবহার করেছে খুনী, ছোরাটা এত জোরে বসানো হয়েছে যে তক্ষুনি পোখ-এর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকল হয়ে যায়।

খুনের কারণ বুঝতে কারুরই কোনো দেরি হলো না। সেই ব্রীফ-কেসের শূন্যতাটা যথেষ্ট জাজ্বল্যমান ও বায়।

+

কিন্তু বন্ধ ঘরটার মধ্যে খুনী ঢুকেছিল কী করে? দরজাটা তো বন্ধ ছিলো, ক্রোফ আর ব্রোক্সকে শেষটায় দরজা ভেঙে ঢুকতে হয়েছিলো। তাহলে নিশ্চয়ই রাস্তার ধারের জানলাটা দিয়েই খুনী ঢুকেছে। বালিশের গায়ে রক্তের দাগ দেখে বোঝা গেল ব্রীফ-কেসটা ছিলো বালিশের নিচে সেটার খোঁজ করতে গিয়ে খুনী রক্তমাখা হাতে চারপাশে হাড়েছে আর রক্তের দাগ লেগে গিয়েছে। পনেরো হাজার রুবল বার করে নিয়ে খুনী তারপর ব্রীফ-কেসটা টেবিলে রেখে চলে যায়।

ক্রোফের সামনেই তদন্ত চলছিলো। কেরস্টোফের জেরার জবাবে বেশ বুদ্ধিমান উত্তর দিচ্ছিলো ক্রোফ। তবে তাকে ভালো করে সবকিছু জিগেশ করার আগে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নেয়া উচিত। খুনী যদি পালাবার সময় রাস্তায় কোনো সূত্র ফেলে যায়।

ডাক্তার হামিনে, ইয়োহাউজেন, ক্রোফ ও রিগার পুলিশদের নিয়ে মেজর ফেরডের আর বিচারপতি কেরস্টোফ রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। যে-সব চাষী ও কাঠুরে হাঁ করে সব দেখছিলো, তাদের পুলিশ আরো দূরে সরিয়ে দিলে।

প্রথমে ঘরের জানলাটা অন্তত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো। ডান দিকের খড়খড়িটা জীর্ণ ছিলো, কোনো শক্ত কিছু ঢুকিয়ে খড়খড়ি তুলে জোরে হ্যাঁচকা টান মেরে আস্ত ছিটকিনিটাই তুলে নেয়া হয়েছে। তারপর খুনী জানলার একটা শার্সি ভেঙেছে– নিচে

কাঁচের টুকরো পড়ে আছে এলোমেলো, তারপর হাত ঢুকিয়ে ভিতরকার খিলটা খুলে ফেলে ভিতরে ঢুকেছিলো আততায়ী– দুষ্কর্মের পরে এই পথ দিয়েই সে চম্পট দিয়েছে।

অজস্র পায়ের ছাপ দেখা গেলো রাস্তায়। ঝড়-বৃষ্টিতে মাটি ভেজা ছিলো, কিন্তু এত লোকের পায়ের ছাপ সেখানে আছে, আর এমনভাবে একটার উপর আরেকটা ছাপ পড়েছে যে পায়ের ছাপ দেখে কোনো কিছুই বোঝা গেল না। পুলিশ আসার আগে নিশ্চয়ই প্রচুর কৌতূহলী লোক ভিড় করেছিলো সরাইয়ের সামনে একা ক্রোফের পক্ষে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি!

মেজর ফেরডের আর কেরস্টোফ তারপর গেলেন সেই অজ্ঞাত যাত্রীটি যে ঘরে ছিলো, তার জানলার কাছে। গোড়ায় সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়লো না। খড়খড়ি বন্ধ। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে জানলার গোবরাটে কতগুলো আঁচড়ের চিহ্ন দেখা গেলো, দেয়ালেও কিসের আঁচড় লেগেছে সম্ভবত কেউ ঐ জানলা দিয়ে রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিলো।

সব্বাই ভিতরে এসে এবার অচেনা যাত্রীটির ঘরে ঢুকে দেখলেন। অন্ধকারে ঢাকা বন্ধ ঘর, মেজর ফেরডের গিয়ে জানলাটা খুলে দিতেই ঘরে আলো এসে ঢুকলো। দুটো কাঠের চেয়ার ঠিক জায়গামতো রয়েছে, বিছানাটা দেখে বোঝা গেলো কেউ তাতে পরশু রাতে শোয়নি, টেবিলের উপর মোমবাতিটার পোড়া টুকরো পড়ে আছে। জানলার গোবরাটে আর দেয়ালে সেই কয়েকটা আঁচড় ছাড়া আর কোনো সূত্রই পাওয়া গেলো না। ঐ আঁচড়গুলো অবিশ্যি খুব জরুরি ও রহস্যময়।

ক্রোফের ঘর, মুরগির খাঁচা, শবজি-বাগান- সবখানেই একবার করে গিয়ে অনুসন্ধান করা হলো। না, বাইরে থেকে কেউ যে রাত্তিরে এই সরাইতে ঢুকেছিলো, এদিকটায় অন্তত তার কোনো ইঙ্গিত নেই। পোখ-এর ঘরের জানলা দিয়েই আততায়ী ঢুকেছিলো, তবে জানলাটা যেহেতু রাস্তার উপর সেইজন্যই বাইরের কারুর পক্ষে ভিতরে ঢোকা একেবারে অসম্ভব ছিলো না।

তারপর সরাইওলাকে জেরা শুরু করলেন কেরস্টোফ। বড়ো ঘরটায় বসলো তদন্ত কমিটি। পাশেই বসলো আদালতের কেরানি। মেজর ফেরডের, ডাক্তার হামিনে ও হের ইয়োহাউজেন– সবাই সরাইওলার এজাহার শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে ছিলেন, তাঁরা পাশেই গোল হয়ে বসলেন। তারপর ক্রোফকে বলা হলো সে যা জানে সব খুলে বলতে।

ধর্মাবতার, ক্রোফ সরাসরি বলতে শুরু করে দিলে, পরশু রাত আটটা নাগাদ দুজন যাত্রী ঝড়ের মধ্যে সরাইখানায় এসে হাজির হয়, রাতটা তারা সরাইতে কাটাতে চায়। গাড়ি উলটে পড়েছিলো না কি তাদের, সেই জন্যে একজনে একটু খোঁড়াচ্ছিলো।

সে-ই হলো পোখ, ইয়োহাউজেন ব্যাঙ্কের কেরানি।

হ্যাঁ... এই পরিচয়ই সে দিয়েছিলো আমাকে।... সব বলেছিলো সে, ঝড়ের পাল্লায় ঘোড়াগুলোর নাজেহাল হওয়া, গাড়ি উলটে পড়া, চোট পাওয়া... সব। পায়ে চোট না-লাগলে সেও কোচবাক্সের পাহারাওয়ালার সঙ্গে পেরনাউ চলে। যেতো, কিন্তু বেচারা... তার বদলে কিনা যম তাকে টান দিলো!... কোচবাক্সের পাহারাওলাকে আমি অবিশ্যি দেখিনি, পরের দিন সকালেই তার ফিরে আসার কথা ছিলো... তা সে এসেও ছিলো...

কেরস্টোফ জিগেশ করলেন, রেফেল যাচ্ছিলো কেন পোখ? কিছু বলেছিলো সে-সম্বন্ধে?

না... আমাকে নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে বলেছিলো শুধু, দিব্যি খেলো ভালোমানুষের মতো ... খাওয়াদাওয়ার পর ন-টা নাগাদ সে নিজের ঘরে যায়, আর ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

আর অন্য যাত্রীটি? অন্য যাত্রীটি কেবল রাত কাটাবার জন্য একটা ঘরই চেয়েছিলো, খাবার-দাবার কিছু চায়নি। শুতে যাবার আগে আমাকে কেবল বলেছিলো যে, সে কোচবাক্সের পাহারাওলার ফিরে আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করবে না, ভোরবেলাতেই চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বে।

সে কে, তা কিছু জানা গেছে?

না, ধর্মাবতার। পোখ বেচারাও তার পরিচয় কিছু জানতো না। খেতে-খেতে সে তার সঙ্গী সম্বন্ধে সব বলেছিলো আমাকে সারা রাস্তায় সে নাকি কুল্লে গোটা দশেক কথা বলেছে, সারাক্ষণ নাকি টুপির তলায় মুখ ঢেকে বসেছিলো .....বোধ হয় কেউ তাকে চিনে ফেলুক এটা তার উদ্দেশ্য ছিলো না। আমিও তর মুখটা দেখতে পাইনি। কী-রকম দেখতে, জিগেশ করলে আমি কিছুই বলতে পারবো না।

ওরা দুজনে যখন আসে, তখন সরাইতে অন্য-কেউ ছিলো?

এখানকার জনাছয়েক চাষী আর কাঠুরে ছিলো। আর ছিলেন সারজেন্ট য়েক আর তার এক অনুচর।

সারজেন্ট য়েক ছিলো নাকি? ইয়োহাউজেন বলে উঠলেন, সে পোখকে চিনতে পারেনি?

পেরেছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ পোখ-এর সঙ্গে তিনি একটু আলাপ করেছিলেন।

কেরস্টোফ জিগেশ করলেন, তারপর সবাই চলে গেলো? কখন?

সাড়ে-আটটা নাগাদ। আমি তারপর দরজা বন্ধ করে দিই–খিল তুলে দিয়ে তালা এঁটে দিই।

তাহলে বাইরে থেকে দরজা খোলবার কোনো উপায় ছিলো না?

না, ধর্মাবতার।

ভিতর থেকে চাবি ছাড়া কারু পক্ষে দরজা খোলা সম্ভব ছিলো না?

না!

আর সকালবেলায় দরজাটা সে-রকমই তালা-বন্ধ ছিলো?

হ্যাঁ। অচেনা যাত্রীটি ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় চারটেয় তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে... আমি লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিই...। এক রুবল পাওনা হয়েছিলো, আমার প্রাপ্য সে তক্ষুনি চুকিয়ে দেয়। তখনও তার মুখটা ওভারকোটের কলার আর টুপির ডগা দিয়ে ঢাকা ছিলো-

কাজেই মুখটা আর দেখতে পাইনি। দরজা খুলে দিতেই সে চলে গেলো। আমি আবার ভিতর থেকে দরজা এঁটে দিলুম।

কোথায় যাচ্ছে, তা সে কিছু বলেছিলো?

না।

রাত্তিরে কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ শুনেছিলে?

উঁহু, কিছু না।

তোমার নিজের ধারণা কী, ক্রোফ? কেরস্টোফ জিগেশ করলেন, যাত্রীটি চলে যাবার আগেই কি পোখ খুন হয়েছিলো?

আমার তো তা-ই মনে হয়।

তা, সে চলে যাবার পর তুমি কী করলে?

আমি আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তখনও পুরো সকাল হয়নি, আলো ফোটেনি... উঠে করবো কী? তবে আমি আর ঘুমোইনি।

তার মানে চারটে থেকে ছটার মধ্যে পোখ-এর ঘরে কোনো ধস্তাধস্তি বা চাঁচামেচি হলে তুমি ঠিক শুনতে পেতে?

নিশ্চয়ই পেতুম। কারণ আমার ঘরটা বাগানের দিকে ফেরানো হলেও আসলে পোখ-এর ঘরের একেবারে লাগোয়া। কাজেই কোনো ধস্তাধস্তি হলে শুনতে পেতুম বৈকি!

তা ঠিক,বললেন মেজর ফেরডের, কিন্তু পোখ বেচারি ধস্তাধস্তি করারও সময় পায়নি-ঘুমন্ত অবস্থাতেই ছোরার ঘা খেয়েছে।

তবে সব শুনে ওটা স্পষ্ট বোঝা গেলো যে সেই রহস্যময় যাত্রীটি সরাই ছেড়ে চলে যাবার আগেই খুনটা হয়েছিলো। তবে একেবারে নিশ্চিত আর কী করে হওয়া যাবে? কারণ চারটে থেকে পাঁচটা অব্দি একে চারদিক ছিলো অন্ধকার, তার উপর ছিলো বিষম ঝড়। এই দুর্যোগের মধ্যে রাস্তাও নিশ্চয়ই ছিলো ফাঁকা ফলে বাইরে থেকে কেউ যদি ভিতরে ঢুকেও থাকে, তবে তাকে দেখাও সম্ভব ছিলো না, কোনো আওয়াজও শোনা যেতো না।

কেরস্টোফ যা-ই জিগেশ করতে লাগলেন, ক্রোফ তারই সরাসরি উত্তর দিতে লাগলো। তারও উপর যে সন্দেহ পড়তে পারে, এটা সে বোধ হয় একবারও ভাবেনি। সব শুনে যেটা বোঝা গেলো তা এই : আততায়ী এসেছিলো বাইরে থেকে, জানলা ভেঙে ঢুকেছিলো ভিতরে, তারপর পোখকে হত্যা করে পনেরো হাজার রুবল নিয়ে আবার ওই জানলা দিয়েই চম্পট দিয়েছিলো।

খুনের ব্যাপারটা ক্রোফ টের পেলো কী করে, সেটা সে খুলে বললে। সাতটা নাগাদ সে যখন বড়ো হল ঘরটায় টুকিটাকি কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, ব্রোক্স তখন পেরনাউ থেকে ফিরে এসেছে... দুজনে মিলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পোখকে জাগাবার অনেক

চেষ্টা করলে ... যখন কোনো উত্তরই এলো না, তখন বিপদের আশঙ্কা করে দুজনে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে ... ঢুকেই দ্যাখে রক্তারক্তি কাণ্ড...

তখন যে পোখ-এর দেহে প্রাণ ছিলো না, তা তুমি হলফ করে বলতে পারবে?

পারবো, ধর্মাবতার। নিশ্বেস পড়ছিলো না। ব্রোক্স আর আমি অনেক চেষ্টা করেছিলুম ... কিন্তু বুকের মধ্যে ছোরা ঢুকেছে, আর কি কেউ বাঁচে!

আততায়ী যে-অস্ত্রটা ব্যবহার করেছিলো, সেটা তুমি খুঁজে পাওনি?”

না, ধর্মাবতার। ছোরাটা বোধহয় সে নিয়ে গিয়েছে!

পোখের ঘর যে ভিতর থেকে বন্ধ ছিলো, এটা তুমি হলফ করে বলতে পারবে তো?

হ্যাঁ–খিলও ভোলা ছিলো, তালাও লাগানো ছিলো। ব্রোক্সও তার সাক্ষী আছে। বন্ধ ছিলো বলেই তো দরজাটা ভাঙতে হলো আমাদের।

তারপর ব্রোক্স চলে গেলো?

হ্যাঁ, ধর্মাবতার, আর এক মুহূর্তও সে দাঁড়ায়নি। তক্ষুনি পেরনাউ গিয়ে কর্তৃপক্ষকে খবর দিতে চাচ্ছিলো সে। পেরনাউ থেকে শীগগিরই দুজন পুলিশ চলে আসে।

ব্রোক্স তারপর আর ফেরেনি?

না, তবে আজ সকালে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ওকেও তো এজাহার দিতে হবে কিনা!

আচ্ছা, হের কেরস্টোফ বললেন, এবার তুমি যেতে পারো, তবে সরাই ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। ডাকলেই যেন তোমাকে পাওয়া যায়!

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবার আগে ক্রোফকে তার পুরো নাম, বয়েস, পেশা ইত্যাদি সব তথ্য জানাতে হয়েছিলো; আদালতের কেরানিটি পুরো প্রশ্নোত্তরটাই টুকে নিয়েছিলো। ক্রোফের এজাহার থেকে যে তথ্যগুলো জানা গেলো, কেরস্টোফ সে-সব জুড়ে-জুড়ে মিলিয়ে দেখছেন, এমন সময় খবর এলো যে ব্রোক্স ফিরে এসেছে। তক্ষুনি তার ডাক পড়লো। ক্রোফের পরেই তার সাক্ষ্যের গুরুত্ব।

ব্রোক্সকেও প্রথমে নাম-ধাম পেশা জিগেশ করা হলো– সেও সব যথাযথ বললে। কোচবাক্সের যাত্রীদের কথা সে বর্ণনা করলে প্রথমে, গাড়ি উলটে যাওয়া, পোখ-এর জখম হওয়া, যাত্রী দুজনের এই সরাইতে রাত কাটাতে আসার কারণ সব সে ঠিকঠাক বললে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রক্তারক্তি দেখার যে-বিবরণ সে দিলে, তা ক্রোফের বিবরণের সঙ্গে মিলে গেলো। তবে ব্রোক্স একটা কথা বললে, যেটা বেশ বিবেচনাযোগ্য। রাস্তায় পোখ নাকি গাড়ির মধ্যে না-ভেবেচিন্তেই তার ব্রীফ-কেসের কথা বলেছিলো– অর্থাৎ তার সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের টাকা আছে, এটা সে আদৌ লুকোয়নি।

কোচবাক্সের রহস্যময় যাত্রীটির কথা জিগেশ করতেই ব্রোক্স জানালে, উঁহু, তাকে আমি চিনি না- মুখটাই একবারও ভালো করে দেখতে পাইনি, তো চিনবো কী করে।

ঠিক গাড়ি ছাড়ার সময়ে এসে সে হাজির হয়েছিলো?

www.bengaliebook.com

মিনিট কয়েক আগেই এসেছিলো।

আগে থেকে আসন সংরক্ষিত করে রেখেছিলো কি?

আজ্ঞে না।

রেফেলে যাচ্ছিলো কি?

রেফেল আব্দি ভাড়া দিয়েছিলো, কেবল এ-কথাই আমি বলতে পারি।

পরের দিন তোমরা কোচবাক্স মেরামত করে ফিরে আসবে, তাই তো ঠিক হয়েছিলো, না?"

হ্যাঁ, ধর্মাবতার। ঠিক ছিলো, পোখ আর সে আবার ওই গাড়িতে করেই যাবে।

অথচ পরদিন ভোরবেলায় সে সরাই থেকে চলে যায়?

হ্যাঁ, ধর্মাবতার। ক্রোফ যখন বললে যে সে চলে গেছে, শুনে আমি ভারি অবাক হয়েছিলুম।

কিন্তু তার এই আচমকা চলে যাওয়া থেকে তোমার কী মনে হয়?

আমি ভেবেছিলুম, তার হয়তো পেরনাউতে কোনো কাজ আছে আর পেরনাউ যেহেতু কাছেই, সেইজন্য হেঁটেই চলে গেছে।

তাই যদি তার উদ্দেশ্য হয় তো গাড়ি ওলটাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে তো চলে। যেত। খামকা এই সরাইতে সে রাত কাটাতে গেলো কেন?

হ্যাঁ, ধর্মাবতার, ব্রোক্স সায় দিলে, আমার কাছেও ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য ঠেকেছিলো।

ব্রোক্সকে আর কিছু জিগেশ করবার ছিলো না বলে তাকে তখনকার মতো ছুটি দেয়া হলো। সে চলে যেতেই মেজর ফেরডের ডাক্তার হামিনেকে জিগেশ করলেন, আপনি কি মৃতদেহটা আবার পরীক্ষা করতে চান?

না মেজর, ডাক্তার জানালেন, আমি জখমের ধরন, ঠিক কোন্ জায়গায় ঘা লেগেছে, কতটা চোট লেগেছে, সব টুকে নিয়েছি।

ছোরারই ঘা তো?

হ্যাঁ।

ইয়োহাউজেন জিগেশ করলেন, তাহলে কি মৃতদেহটা রিগায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বলবো? সেখানেই তার অন্ত্যেষ্টি হবে কিনা।

কেরস্টোফ মৃতদেহটা নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন।

আমরাও তো তাহলে এখন যেতে পারি? ডাক্তার জিগেশ করলেন।

হ্যাঁ, মেজর বললেন, এখানে তো আর কিছু জিগেশ করার নেই।

যাবার আগে, হের কেরস্টোফ বললেন, আমি আরেকবার পোখের ঘরে যেতে চাই। হয়তো আগের বারে সব আমরা ঠিকমতো লক্ষ করিনি।

ক্রোফকে ডেকে নিয়ে আবার সবাই মিলে পোখের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কেরস্টোফ ঘরের চুল্লির পাশে পড়ে-থাকা ছাই নেড়েচেড়ে দেখতে চাচ্ছিলেন– যদি সেখানে সন্দেহজনক কিছু পড়ে থাকে। আর সেটা দেখতে গিয়েই চুল্লির পাশের কয়লা ঠাশা হাতুড়িটার দিকে তাঁর নজর পড়লো। তুলে নিয়ে সেটা নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়েই আবিষ্কার করা গেলো যে সেটা কী রকম যেন দুমড়ে গেছে, যেন সেটা দিয়ে খুব জোরে কিছু একটা করা হয়েছে। এটা দিয়েই কি চাপ দিয়ে পোখের জানলার খড়খড়ি খোলা হয়েছে? সম্ভবত। বিশেষ করে দেয়ালের গায়ের আঁচড়গুলো দেখে সন্দেহটা আরো জোরালো হয়। সরাইখানা থেকে বেরিয়েই কেরস্টোফ তার সন্দেহটা খুলে বললেন।

খুনটা করতে পারতো মাত্র তিনজনে। বাইরের কোনো লোক, কিংবা সরাইওলা, অথবা সেই রহস্যময় যাত্রীটি... কিন্তু কয়লা ঠাশার হাতুড়িটা দেখবার পর সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে যায়। পোখের ব্রীফ-কেসে যে প্রচুর টাকা আছে, ঐ যাত্রীটি তা জানতো। রাতে নিজের ঘরের জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসে সে, তারপর এই কয়লা ঠাশার হাতুড়িটাকে কীলক হিশেবে ব্যবহার করে পোখের ঘরের জানলা খুলে সে ভেতরে ঢুকে পড়ে। পোখকে খুন করে ব্রীফ-কেস থেকে সব টাকা হাতিয়ে তারপর জানলা দিয়েই সে নিজের

ঘরে ফিরে আসে। চারটে বাজতেই চটপট সে সরাই ছেড়ে চলে যায় না, ঐ রহস্যময় যাত্রীটিই যে আততায়ী, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে এই রহস্যময় যাত্রী? তাকে শনাক্ত করা যাবে কী করে?

মেজর ফেরডের বললেন, হের কেরস্টোফ যা বললেন হয়তো তা-ই ঘটেছিলো। তবে খুনের মামলায় তদন্ত চালাতে-চালাতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সব জটিলতা দেখা দেয়। আমি বরং ঐ যাত্রীটির ঘর তালা বন্ধ করে চাবিটা নিয়ে আসি, আর দুটি লোককে ও-ঘরের পাহারায় রেখে দিই। তারা সারাক্ষণ সরাইলও আর ঐ ঘরটার উপর নজর রাখবে।

সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করে সবাই যখন কোচবাক্সে উঠতে যাবেন, ইয়োহাউজেন হঠাৎ কেরস্টোফকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি কিন্তু আপনাদের একটা কথা বলিনি। আমার মনে হয় কথাটা আপনার জানা উচিত।

বলুন।

চোরাই নোটগুলোর নম্বর আমার কাছে টোকা আছে। দেড়শো নোট ছিলো–সব একশো রুবলের নোট।

আপনি তাহলে নম্বর রেখেছেন?

হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক থেকে তা-ই করা হয় সবসময়। বলটিক দেশগুলোয় আর রাশিয়ার সব ব্যাঙ্কে নম্বরগুলো জানিয়ে দিলেই হয়।

তাতে কি আমাদের কিছু সুবিধে হবে?চিন্তিতভাবে বললেন, কেরস্টোফ, হয়তো কথাটা আততায়ীর কানে পৌঁছে যাবে, ভয় পেয়ে সে হয়তো দেশ ছেড়েই কোথাও চলে যাবে... যেখানে নম্বরগুলোর কথা কেউ জানে না, হয়তো সেখানে সে নোটগুলো ভাঙিয়ে ফেলবে। আপনি বরং আপাতত সব চেপে যান, হয়তো টাকা ভাঙাতে গিয়েই সে ধরা পড়ে যাবে!

একটু পরেই সবাইকে নিয়ে কোচবাক্স ছেড়ে দিলো।

.

৮. ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৬ এপ্রিল বিকেলবেলায় লিভোনিয়ার ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কয়েকজন ছাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। উত্তেজিতভাবে তকাতর্কি হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে, মশমশে জুতোর শব্দ করতে-করতে তারা পায়চারি করছে, একেকজনের কোমরে চামড়ার বেল্ট, মাথায় ছাত্রদের টুপি।

একজন বলছিলো, আমি বাপু গ্যারান্টি দিতে পারি আজ টাটকা মাছ খেতে পাওয়া যাবে। আ থেকে এসেছে মাছগুলো, কাল রাত্তিরেই ধরা হয়েছে। কুমেলে ভালো করে ধুয়ে

নেবার পর মাছগুলো যার কাছে মুখরোচক ঠেকবে না, তার মাথার খুলি বাপু এক্ষুনি ফাটিয়ে দেবো।

বড়ো ছাত্রদের একজন জিগেশ করলে, কী হে জিগফ্রিড, তোমার কী মত?

আমার? জিগফ্রিড উত্তর দিলে, আমি পাখির মাংসের তদারকি করছি—আমি যা খেতে দেবো, তা যার পছন্দ হবে না, সেই মহাশয়কে এই অধমের সঙ্গে একটু লড়তে হবে।

কড়াইশুঁটিওলা মাংস রাঁধছি বাপু, তাজা হ্যাম, তৃতীয় একজন জানালে, কেউ যদি বলে যে এর চেয়ে ভালো রান্না কস্মিনকালে চেখে দেখেছে, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। কার্ল, তোমার ভালো লাগবে আশা করি।

চমৎকার! কার্ল বললে, বিশ্ববিদ্যালয় দিবস তাহলে চমৎকার জমছে, বলো! অবিশ্যি ঐ মস্কোপন্থী কোনো স্লাভ থাকলেই সব মাটি হয়ে যাবে।

না, জিগফ্রিড বললে, কোনো মস্কোওলার বুকের পাটা হবে না স্লাভ। পোশাক পরে আসে।

এলে তাকে কেটেকুটে সমান মাপে টেনে নামাতে হবে। স্লাভদের ওই যে সর্দারটা আছে না, সব্বাই যার চেলা, ঐ জাঁ– সে যদি বেশি টাল্লিবাল্লি করে তো তাকে আমি একহাত দেখে নেবো। তোমাদের সবাইকে বলে রাখছি বাপু, শিগগিরই একদিন ওর সঙ্গে আমার হয়ে যাবে। যে-আলেমানদের সে অত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদের সামনে একদিন ওকে

মাথা নোয়াতেই হবে আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার আগেই তার ব্যবস্থা করবো! কার্ল জানালে।

যেমন গুরু, তেমনি চেলা, ওই গোসপোদিনটাও কিছু কম যায় না! জিগফ্রিড বললে।

ও গোসপোদিন-কসপোদিন ছাড়ান দাও। স্লাভ মানে হলো স্লেভ–মানে গোলামের জাত! জার্মানদের সঙ্গে তাদের আবার তুলনা!

কথাবার্তা শুনে বোঝা গেলো যে ওরা বিশ্ববিদ্যালয় দিনের নৈশভোজের জন্য যতটা উৎসুক হয়ে আছে তার চেয়েও বেশি উৎসুক হয়ে আছে কতগুলো স্লাভ ছাত্রের সঙ্গে মারপিট করার জন্য। এই জার্মান ছোকরাদের সর্দার হলো কার্ল, ব্যাঙ্কার ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই তার শেষ বছর, তারপর রিগায় ফিরে গিয়ে সে বাপের ব্যাবসায় ঢুকে পড়বে। আর যার উপরে তাদের সবচেয়ে জাতক্রোধ সে হলো রিগার অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফের ছেলে জাঁ। অনেকদিন থেকেই কার্ল অর জাঁর মধ্যে রেষারেষি চলে আসছে, কেউ কাউকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। কাদের প্রধান চেলা যেমন জিগফ্রিড, জার শাগরেদও তেমনি এই গোসপোদিন, এস্তোনিয়ার এক সম্পন্ন ঘরের ছেলে। গোসপোদিন এমনিতে খুব হাসিখুশি দিলদরিয়া ছেলে, খেলাধুলোয় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জুড়ি নেই। জাঁ নিকোলেফ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, চাপা ভাবুক স্বভাব তার, প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ রয়েছে, এতটা কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া এ বয়সে অনেক সময়ে তেমন মানায় না। গোসপোদিনের সঙ্গে তার গলাগলি ভাব। জার্মানদের হাম্বড়া ভাব ও প্রচণ্ড দেমাকি চালচলনের মধ্যে এরাই স্লাভদের আদর্শ ও সম্মান বজায় রাখতে চায় বলেই এদের উপর। কার্ল ও জিগফ্রিডের এত রাগ।

জার্মান ছোকরারা যখন জাঁ আর গোসপোদিনকে শায়েস্তা করার বিষয় নিয়ে কথা বলছিলো তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অংশে স্লাভ ছেলেরাও কার্ল ও জাঁর রেষারেষি নিয়ে কথা বলছিলো। কার্লের এই দেমাক, ধরাকে সরাজ্ঞান করা, এ-সব গোসপোদিনের মোটেই পছন্দ নয়, সেজন্যেই সে জাঁকে তাতাবার চেষ্টা করছিলো। যদি তাকে একবার চেতিয়ে তোলা যায়, তাহলে এস্পার-ওস্পার একটা কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু জাঁ খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে, সাত চড়েও রা কাড়ে না। তার সমবোধ খুব টনটনে, কিন্তু অহেতুক ছেলেমানুষি করার পক্ষপাতী সে নয়। এটা সে ঠিক জানে একদিন কার্লের সঙ্গে তার একটা বোঝাঁপড়া হবেই হবে, সেই মুহূর্ত আসন্ন ও অনিবার্য; কিন্তু নিজে থেকে কোনো গণ্ডগোল সে শুরু করতে চায় না। তার একটা কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলের ছেলেদের মতো শাস্তি না দিয়ে ইচ্ছে করলেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাউকে বিতাড়িত করতে পারেন। জাঁ এমন-কিছু করতে চায় না যেটা তার পড়াশুনোর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে।

অথচ রিগায় যে ইয়োহাউজেনদের সঙ্গে নিকোলেফদের একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়েও তার সাড়া পড়েছিলো। আগামী নির্বাচনে যে এঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, এটা ছাত্ররা জানতো। গোসপোদিন গোড়ায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ছেলেদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দিতে চাচ্ছিলো না, কিন্তু যখন কার্লদের টিটকিরি ও ব্যঙ্গ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন সে জাঁকে উশকে দেবার চেষ্টা করলে।

এমন বিধিয়ে-বিধিয়ে সে কথা বলতে লাগলো যে শোনবামাত্র জাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু অনেক করে সে নিজেকে শামলে রাখলে। নতুন কিছু না-ঘটলে সে

পুরোপুরি উদাসীন থাকবে বলেই সাব্যস্ত করলে। সে জানে কার্লরা একটা ছল-ছুতো খুঁজছে, যাতে একটুতেই বারুদের স্কুপে আগুন দিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু জাঁর সমর্থকরা তার এই ঔদাসীন্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলো না। ওরা এরকমভাবে অপমান করে চলে যাবে, আর তারা কিছু বলবে না, এটা কি কখনও হয়? কিন্তু আঁকে তারা এতই মান্য করে যে জাঁর মতের বিরুদ্ধে একটা-কিছু করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। কিন্তু স্লাভরা যদি তোপ দাগা শুরু না করে তো আলেমানরা কি এমনিতেই ছেড়ে দেবে? তারা নিশ্চয়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়-দিবসে একটা-কিছু ঝামেলা পাকাবে বলে এক পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই কথা ভেবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একফোঁটাও স্বস্তি ছিলো না। গত কিছুকাল ধরেই রাজনীতিকে বিশেষ করে স্লাভ বনাম টিউটনিক বিসংবাদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চেপে রাখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ ছেলেই পারিবারিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। আর তার ফলে আস্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেন একটা বারুদের স্কুপ হয়ে আছে একটুতেই বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর চেয়ে ছাত্রদের উপর জাঁ নিকোলেফের প্রভাব বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উৎসব থেকে কার্ল ও তার বন্ধুরা জাঁকে সবান্ধবে বাদ দিতে চাচ্ছিলো, জ যখন কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারলে না, তখন নিজের বন্ধুদের উপর সে নিজের প্রভাব খাটালে, তারা কিছুতেই যেন উৎসবের মধ্যে গোল না বাধায়, গোসপোদিনদের সে এ-বিষয়ে রাজি করালে। ভোজসভায় না ঢুকলেই হয়, এই ছিলো তার বক্তব্য। জার্মান গানের উত্তরে রুশী গান না গেয়ে উঠলেই হলো। তবে যদি তার

পরেও তারা অপমান করে বা টিপ্পনী কাটে, তাহলে আলাদা কথা। তারা বরং অন্যখানে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদা উৎসবের উদ্যোগ করে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতি সম্মান দেখাবে। যতক্ষণ-না অন্য মহল থেকে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিড়ম্বনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবে তারা।

উপাচার্য ভেবেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উৎসব স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেবেন কিন্তু তাতে যদি উপরের মহল থেকে উলটো চাপ আসে, তাহলেই মুশকিল যে ঝামেলাটা বাদ দেবার জন্য অত মাথাব্যথা সেটাই তখন নানা সংঘ ও সমিতির উত্তেজিত বাদপ্রতিবাদে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় তো কোনো হাতেখড়ি দেবার স্কুল নয় যে জুজুর ভয় দেখিয়ে ছেলেগুলোকে শামলাতে হবে। কাউকে-কাউকে অবশ্য তাড়িয়ে দেয়া যায় কিন্তু তেমন কঠোর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবার আগে সব-কিছু ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত।

ভোজসভার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিলো অপরাহ্ন চারটে। ইয়োহাউজেন, জিগফ্রিড ও তার বন্ধুরা ততক্ষণ উঠোনেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে গুলতানি করতে লাগলো। বেশির ভাগ ছাত্রই এসে তাদের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে যেন নেতার কাছে কিংকর্তব্য তার নির্দেশ চাচ্ছে। এদিকে আবার একটা গুজব ছড়িয়েছিলো যে কর্তৃপক্ষ নাকি উৎসব নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিলো; সবাই এসে জানতে চাচ্ছিলো কী ব্যাপার জনরব সত্যি কিনা।

জাঁ নিকোলেফ আর তার বন্ধুরা অবশ্য এ-সব গুজব বা হৈ-চৈ-এ মোটেই কান দিচ্ছিলো না। তারা যথারীতি গল্প করতে-করতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো উত্তেজিত দলের মুখোমুখি পড়ে যাচ্ছে।

সবাই সবাইকে তাকিয়ে দেখছে, স্পষ্টাস্পষ্টি কোনো কথা হচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখের ভঙ্গিতেই অনেকটা বলা হয়ে যাচ্ছে। জাঁ বেশ শান্ত হয়েই আছে কিন্তু চেষ্টা করছে একটা উদাসীন ভঙ্গি আনবার। কিন্তু গোসপোদিনকে শামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। তার চোখে যেন আগুন ভরা নাকি ইস্পাতের ফলার মতোই বুঝি তার চাউনিঃ কার্লকে বুঝি তার চোখের দৃষ্টিতেই একেবারে গেঁথে ফেলবে। মেজাজটাও এমনি তেরিয়া মতো যে লাগে বুঝি একটা হুলুস্থুল! দু-দলের মধ্যে একটা মস্ত ঝামেলা না-পাকিয়ে সে বুঝি থামবে না!

আর এই বিষম অবস্থার মধ্যেই চারটে বেজে গেলো। কার্ল ইয়োহাউজেন তার শাগরেদদের নিয়ে সদলবলে বড়ো হলঘরটার দিকে এগিয়ে গেলো।

একটু পরেই ফাঁকা হয়ে গেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর কেবল রইলো জাঁ নিকোলেফ, গোসপোদিন আর প্রায় জনাপঞ্চাশ স্লাভ ছাত্র। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলেই তারা সেখানে অপেক্ষা করছিলো। কোনো কাজকর্ম ছিল না; কাজেই তারা তক্ষুনি চলে গেলে ভালো করতো। জাঁ নিকোলেফ তাদের এই বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়েছিলো কিন্তু তার প্রস্তাবে কেউ রাজি হলে তো! গোসপোদিন ও তার শাগরেদরা যেন মাটিতে শিকড় গজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন চুম্বকের মতো তাদের টান দিচ্ছে। ভোজসভা।

মিনিট কুড়ি কাটলো চুপচাপ। হাঁটাহাঁটি করছে তারা এদিক-ওদিক, মাঝে-মাঝে চত্বরের দিকের জানলাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেন?... রাগি টিপ্পনী শুনতে, আর উত্তরে চ্যাটাং চ্যাটাং মন্তব্য ছুঁড়ে মারতে? বোধহয় তাই তাদের মতলব!

অতিথিরা আর ভোজসভা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করলে না, তক্ষুনি গান জুড়ে দিলে, আর পানপাত্র নিয়ে শুভেচ্ছাজ্ঞাপনও শুরু হলো। দু-এক চুমুকেই চট করে মাথায় চড়ে গেলো মদ, তাকিয়ে দেখে বুঝলো যে জানলার বাইরে থেকে জাঁ নিকোলেরা তাদের সব কথাই শুনতে পাবে, অমনি তারা ব্যক্তিগত আক্রমণের স্তরে নেমে এলো।

একবার শেষ চেষ্টা করলে জাঁ। বন্ধুদের বললে, চলো, যাই।

না। গোসপোদিন উত্তর দিলে।

না, কিছুতেই না,অন্যরাও ঐকতানে যোগ দিলে।

আমার কথা শুনবে না তোমরা? ঠিক তো?

ওই জার্মান ছোকরাগুলো কী বলতে চায়, তা আমরা শুনবোই, জাঁ। পুরো ব্যাপারটা যদি আমাদের পছন্দ না-হয় তো আমরা যা করবো তোমাকে তা-ই করতে হবে।

ও-রকম জেদ কোরো না, গোসপোদিন। চলে এসো...

দাঁড়াও না এক মিনিট, গোসপোদিন তাকে বললে, তারপর তুমিও আর যেতে চাইবে না।

হলঘরের মধ্যে তখন হৈ-হল্লা-হট্টগোল চরমে পৌঁছেছে, গেলাশের শব্দ হচ্ছে ঝনঝন, আর হঠাৎ তারই মধ্যে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে সবাই গান ধরে দিলে সেই পুরোনো গাউডেয়ামুস ইগিটুর গীত–জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর যোট অতিপ্রিয় ও শ্রদ্ধাশীল ঐকতান।

তারপরেই আচমকা সব ছাপিয়ে একটা গলা শোনা গেলো, রিগা, সোনার দেশ, তোমাকে এত সুন্দর করলো কে! লিভোনীয়দের দাসত্ব। হয়তো একদিন আমরা তোমার জন্য কেল্লা খরিদ করবার টাকাকড়ি জোগাড় করতে পারবো আর তপ্ত ইট-পাথরের ওপর বেড়ালনাচ নাচাবো স্লাভদের!

+

রুশী গানটা প্রথমে গলা ছেড়ে ধরলে গোসপোদিন। তারপরে তার বন্ধুরাও একযোগে তাতে গলা মেলালে।

আচম্বিতে দুম করে খুলে গেলো দরজা, প্রায় শ-খানেক ছাত্র হুড়মুড় বেরিয়ে এলো বাইরে। এসেই তারা স্লভদের ঘিরে ধরলে। স্লাভ ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো জা নিকোলেফ, চেষ্টা করেও কিছুতেই সে বন্ধুদের আর শামলাতে পারছিলো না। কার্ল ইয়োহাউজেন অবিশ্যি ভিতরেই তখনও ঐকতান গাইছে; সে বাইরে বেরোয়নি। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়ালো জিগফ্রিড আর গোসপোদিন।

গোলমাল শুনে স্বয়ং রেক্টর তাড়াহুড়ো করে অকুস্থলে এসে উপস্থিত, সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকও। অবস্থাটা যাতে আয়ত্তের বাইরে চলে না-যায়, ছেলেগুলোকে যাতে শামলে-

শুমলে বুঝিয়ে নিরস্ত করা যায়, সেটাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে রেক্টরের গলা শুনবে কে? এ দিকে আলেমান ছাত্রদের সংখ্যা পিলপিল করে বেড়েই যাচ্ছে হলঘর তাদের উগরে দিচ্ছে অনবরত– এই খ্যাপা ও বদরাগি ছেলেদের তিনি কীই বা বোঝাবেন?

সংখ্যায় অনেক কম, কিন্তু অপমান আর শাসানি সইবে না স্লাভরা। জাঁ নিকোলেফ ও তার সঙ্গীরাও দাঁড়িয়ে আছে অকম্পিত।

জিগফ্রিডের হাতে ছিলো মদের গেলাশ– হঠাৎ সে এসে গোসপোদিনের মুখে মদ ছুঁড়ে মারলে।

প্রথম ঘা, কিন্তু আসলে উটের পিঠে শেষ খড়। লাগে বুঝি একটা তুলকালাম কাণ্ড, কিন্তু সব হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলো, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কার্ল ইয়োহাউজেন। সবাই সরে গিয়ে তার পথ করে দিলো; যাতে সে নিকোলেফের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

কার্ল সত্যি-সত্যি কী ভাবছিলো বলা মুশকিল। শান্ত, গম্ভীর মুখে রোষ বা ক্রোধের চিহ্ন নেই, বরং যতই নিকোলেফের দিকে সে এগুচ্ছে ততই তার মুখ ঘৃণায় ভরে যাচ্ছে। না, তার বন্ধুরা ভুল ভাবলে না- নিকোলেফকে চূড়ান্ত অপমান করাই তার উদ্দেশ্য।

ঐ হট্টগোলের পরেই হঠাৎ যে-স্তব্ধতা নেমে এলো, সেটাই অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছিলো আসলে। গোসপোদিন এগিয়ে এসে কার্লের পথ আটকাবার চেষ্টা করলে। জাঁ তাকে টেনে ধরলে, বললে, না, গোসপোদিন, এটা আমার ব্যাপার।

আমাকে তুমি থামাতে পারবে না, গোসপোদিনের সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যাচ্ছিলো।

ঠাণ্ডা গলায় জাঁ নিকোলেফ বললে, পারবো। তারপর সে গলা চড়িয়ে সবাই যাতে শুনতে পায় এইভাবে বললে, তোমরা কয়েকশো, আমরা পঞ্চাশজনও নই। বেশ, তাহলেও লড়তে এসো। আমরা তোমাদের ঠেকাবো তো বটেই, কিন্তু হেরেও যাবো। অবশ্য হারটাই হবে আমাদের জিৎ, কারণ তোমরা কাপুরুষের মতো কাজ করবে!

উঠলো আবার হৈ-হৈ, কিন্তু কার্ল ইঙ্গিত করতেই সবাই থেমে গেলো। কার্ল বললে, বেশ, আমরা না-হয় কাপুরুষই হলুম। কিন্তু তোমাদের স্লাভদের মধ্যে কেউ কি আছে যে একা লড়বে। আমার সঙ্গে?

আছি, আমরা সবাই আছি। একসঙ্গে চাঁচালে স্লাভ ছেলেরা।

কিন্তু জাঁ নিকোলেফ দু-পা এগিয়ে বললে, আমি আছি। কার্ল যদি চায় ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটার বোঝাঁপড়া হোক, তো আমিই–

তুমি? কার্লের গলা ঘৃণায় বিকৃত শোনালো।

হ্যাঁ, আমি।

তুমি, তুমি আমার সঙ্গে লড়বে?

হ্যাঁ। এখন যদি তুমি তৈরি না-থাকো তো, কাল। চাইলে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।

কিন্তু জাঁ নিকোলেফ, কার্ল উত্তর দিলে, তুমি একটা মস্ত ভুল করেছে। আমি তো তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়বো না...

লড়বে না? কেন?

কারণ তার সঙ্গে কে আর লড়তে যাবে বলো যার বাপ হলো একজন কুখ্যাত খুনে ডাকাত!

হত্যাকারী কে?

৯. হত্যাকারী কে?

পোখকে চিনতো না, এমন লোক রিগায় ছিলো না। দিলদরিয়া, হাসিখুশি, শাদাশিধে মানুষ কাঁধে ঝোলা আর হাতে ব্রীফ-কেস নিয়ে সে হন্তদন্ত ছুটছে, আর মুখে সারাক্ষণ খই ফুটছে–এই দৃশ্য দেখতেই লোকে খুব অভ্যস্ত ছিলো। হঠাৎ তার খুন হওয়ার খবরটা তাই দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো শহরে সব্বাই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

উত্তেজনা ছড়িয়েছিলো এমনকী পুলিশের মধ্যেও। পুলিশের বড়কর্তা কর্নেল রাগুয়েনোফ সুষ্ঠু এই খুনের খবরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অধীর হয়ে উঠেছিলেন। বিভাগের সবচেয়ে ধুরন্ধর গোয়েন্দাদের লাগিয়ে দিয়ে যত চটপট পারা যায় রহস্য ভেদ করবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন।

১৬ তারিখ সকালবেলায় এই নিয়েই মেজর ফেরডেরের সঙ্গে তার কথা হচ্ছিলো। প্রাথমিক তদন্তের বিস্তৃত প্রতিবেদন দিয়ে মেজর ফেরডের ওপরওলার নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। পুরো ব্যাপারটা শুনে কর্নেল বললেন, হুম, তোমার তাহলে ধারণা অন্য যাত্রীটিই খুন করেছে?

সব দেখেশুনে তা-ই তো মনে হয়।

আর সেই সরাইওলা? ক্রোফ-এর হাবভাবে কিছু সন্দেহজনক দ্যাখোনি?

সেও যে খুন করতে পারে, এই সম্ভাবনাটাও আমি একেবারে উড়িয়ে দিইনি– যদিও তার সম্বন্ধে আমরা কখনো কোনো অভিযোগ শুনিনি। কিন্তু সেই রহস্যময় যাত্রীটি যে-ঘরে রাত কাটিয়েছিলো সে-ঘরের জানলায় ও সব দাগটাগগুলো দেখে মনে হয় ক্রোফ-এর এ-ব্যাপারে কোনো হাত নেই। খড়খড়ি আর ছিটকিনি খোলবার জন্য যে- হাতুড়িটা ব্যবহার করা হয়েছিলো সেটাও যখন ও ঘরে পাওয়া গেলো...

হুম। তবু ক্রোফ-এর উপর নজর রেখো।

নিশ্চয়ই রাখবো। দুজনকে সরাইখানায় পাহারায় রেখে এসেছি। তাছাড়া ক্রোফকেও বলেছি, সে যেন কোথাও না-যায় তাকে পরে আরো দরকার হতে পারে।

তাহলে এটা বাইরের কোনো লোকের কাজ বলে তোমার মনে হয় না? সেরাতে ঐ সরাইখানায় যারা ছিলো, তাদেরই কেউ হত্যাকারী বলে তোমার ধারণা?

ততটা নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে পোখ-এর সঙ্গে অন্য যে-যত্রীটি ছিলো তার বিরুদ্ধে এত প্রমাণ যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন অন্য-কিছু সন্দেহ করাও খুব কঠিন।

তুমি দেখছি মোটামুটি মনঃস্থির করে ফেলেছো?

জজ কেরস্টোফ, ডাক্তার হামিনে আর হের ইয়োহাউজেনেরও তা-ই ধারণা। লোকটি যে-রকমভাবে নিজের পরিচয় গোপন রাখবার চেষ্টা করছিলো, যে-রকম রহস্যময় তার ধরনধারণ, তাতে তাকে সন্দেহ না-করে উপায় কী?

সরাই ছেড়ে যাবার সময় সে কোথায় যাচ্ছে, তা বলেনি?

না।

রিগা থেকে যখন কোচবাক্সে উঠলো, তখন তার গন্তব্য পেরনাউ বলেই তো মনে হয়।

তা হয়। কিন্তু সে শুধু রেফেল অব্দি টিকিট কেটেছিলো।

দু-তিনদিনের মধ্যে পেরনাউতে কোনো অচেনা লোক দেখা যায়নি? তুমি খোঁজ নিয়েছিলে?

নিয়েছিলুম। পুলিশও অবশ্য এখনও খোঁজ করছে, কিন্তু এ-যাবৎ। লোকটার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি।... কোথায় যে সে গেলো! পেরনাউ গিয়েছিলো কি শেষ অব্দি? নাকি অত টাকা নিয়ে বলটিক প্রদেশ ছেড়েই কেটে পড়েছে?

তা সম্ভব। বিশেষ করে কাছেই যখন এত বন্দর আছে, তখন তার পক্ষে এ-তল্লাট ছেড়ে চলে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়।

হুঁ, সে সুযোগ যে আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বললেন মেজর ফেরডের, কিন্তু, ফিনল্যাণ্ড উপসাগর বা বলটিকের তীরের সমুদ্রে এখন জাহাজই চলছে না। আমি খবর পেয়েছি যে ঠাণ্ডায় সব এমনি জমে আছে যে সম্প্রতি কোনো জাহাজই বন্দর থেকে ছাড়তে পারেনি। কাজেই লোকটা যদি সাগরপাড়ি দিতেই চায়, তাহলে তাকে আরো

কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে–তা কোনো বন্দরেই হোক বা পেরনাউতেই হোক। এমনকী রেফেলেও হতে পারে।

রিগা হলেই বা বিচিত্র কী? কর্নেল রাগুয়েনোফ যোগ করলেন, এখানে ফিরে আসতেই বা তার বাধা কী? হয়তো তা-ই সে করেছে পুলিশ যাতে পিছু ছেড়ে দেয়, যাতে সে অনেকটা স্বস্তি পেতে পারে, সেদিক থেকে রিগার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কী আছে? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। সব বিষয়েই আমাদের নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। আমি তো জানিয়ে দিয়েছি, বন্দর ছেড়ে যাবার আগে সব জাহাজই যেন ভালো করে তল্লাশ করে নেয়া হয়। সপ্তাহ শেষ হবার আগে বরফ গলবে বলে মনে হয় না–সারা শহর ও বন্দরে ততক্ষণ যেন কড়া নজর রাখা হয়, আমি জানিয়ে দিয়েছি।

মেজর ফেরডেরের সব ব্যবস্থাই মোটামুটি মনঃপূত হলে কর্নেলের। হত্যাকারী কে, সে-সম্বন্ধে তার নিজেরও আসলে কোনো সংশয় ছিলো না। সেই রহস্যময় ও অজ্ঞাত পরিচয় যাত্রীটিই যে হত্যাকারী, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কে সে? কী তার পরিচয়? কেউ তার মুখ দ্যাখেনি–না সরাইওলা ক্রোফ, না বাসের কণ্ডাকটার ব্রোক্স-কেউ তাকে স্পষ্ট করে দ্যাখেনি একবারও। এমনকী লোকটার বয়েস কত, সে কি যুবক না প্রৌঢ়, তাও জানা নেই। এ-ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের তিনি কীই-বা নির্দেশ দেবেন? কোনখানেই বা সন্ধান নিতে বলবেন? কেবল যদি দৈব কখনো সদয় হয়, তাহলেই হয়তো এই জটিল রহস্যের জট ছাড়ানো সম্ভব হবে। যতক্ষণ তা-না হয়, ততক্ষণ অন্ধকার।

+

সেইদিনই সকালবেলা মামলাটার ডাক্তারি প্রতিবেদন নিয়ে ডাক্তার হামিনে নিজে গিয়েছিলেন বিচারপতি কেরস্টোফের আপিসে।

কী? নতুন কোনো সূত্র পাওয়া গেলো? হের কেরস্টোফকে তিনি জিগেশ করলেন।

উঁহু।

কেরস্টোফের আপিশ থেকে বেরোতেই পথে হঠাৎ ফরাশি রাষ্ট্রদূত মঁসিয় দ্যলাপোত্রে সঙ্গে ডাক্তার হামিনের দেখা হয়ে গেলো। এই জটিল ও রহস্যময় মামলাটা নিয়েই কথা হলো দুজনে।

দ্যলাপোর্ৎ বললেন, সেই রহস্যময় যাত্রীটিই যদি হত্যাকারী হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যে কী করে তাকে খুঁজে পাবেন, আমি তা ভেবেই পাচ্ছি না...

হ্যাঁ, ভালো কথা, নিকোলেফের কোনো খবর জানেন?

দিমিত্রির খবর? না তো। উনি তো এখানে নেই...

আশ্চর্য, না? তিনদিন হলো দিমিত্রি গেছেন, অথচ এ পর্যন্ত এমনকী তার মেয়েকেও কোনো খবর পাঠাননি।

চলুন না,ডাক্তার বললেন, একবার ওঁদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। হয়তো আজকেই ইলকা কোনো চিঠি পেয়ে থাকবে কিংবা নিকোলেই হয়তো ফিরে এসেছেন।

অধ্যাপক নিকোলেফের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তার কোনো খবরই পাওয়া গেলো না। তিনি ফেরেনও নি, কোনো চিঠিও আসেনি; কোথায় গেছেন, তা অব্দি কেউ জানে না; কেন গেছেন, তাও নয়। ইলকা বেচারিকে বড় উদ্বিগ্ন দেখালো। লিভভানিয়ার পথ-ঘাট আজকাল, মোটেই নিরাপদ নয়। কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো পথে তাছাড়া যাবার আগে তাকে বড্ড অস্বাভাবিক, বড্ড চঞ্চল,বড্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছিলো। এমনকী তিনি যে যাচ্ছেন, তাও তিনি ইলকাকে বলেননি, কেবল একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছেন।

ইলকা বেচারির দুর্ভাবনা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা তাকে উলটে সান্ত্বনা ও আশা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। মিথ্যে ভাবনা কোরো না, ইলকা। নিশ্চয়ই আজকালের মধ্যেই তোমার বাবা ফিরে আসবেন। এ-কথা ডাক্তার হামিনে মুখে বললেন বটে, কিন্তু কেন যেন তারও মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি কাটার মতো বিঁধছিলো।

+

ঐ একই সময়ে মেজর ফেরডেরের পড়ার ঘরে কিন্তু আরেকটা নতুন খবর এসে পৌঁছেছে। য়েক-এর নেতৃত্বে যে-বাহিনীটি বেরিয়েছিলো, সকালবেলাতেই তারা রিগায় এসে হাজির হয়েছে। ফিরে এসেই সারজেন্ট য়েক বড়োকর্তার কাছে তার তদন্তের প্রতিবেদন পাঠিয়ে দিয়ে নিজের আপিশে এসে বসেছিলো। সেইখানেই সে খুনের খবরটা প্রথম জানতে পেলো। এই হত্যারহস্যের চাবিটা যে তারই হাতে ছিলো, এটা আর কারু পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব ছিলো, এমনকী য়েক নিজেও বুঝতে পারেনি তার সাক্ষ্য কতটা জরুরি হবে।

মেজর ফেরডের যখন জানতে পেলেন যে ঐ খুনের মামলা সম্বন্ধে সারজেন্ট য়েক-এর কিছু বক্তব্য আছে, তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

লোখকে কে খুন করেছে, তা তুমি জানো? সত্যি?

নিজের চোখে লোকটাকে দেখেছি।... পোখকে আমি আগে থেকেই চিনতুম রিগায় তাকে কে না চেনে? তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে তেরো তারিখ রাত্তিরে।

কোথায়?

ক্রোফ-এর সরাইখানায়।

তুমি তখন ঐ সরাইতে ছিলে?

হ্যাঁ। পেরনাই ফিরে যাবার আগে এক সহকারীকে নিয়ে খানিকক্ষণের জন্য আমি ঐ সরাইখানায় গিয়েছিলুম।

বেচারা পোখ-এর সঙ্গে তখন তোমার কথা হয়েছিলো?

একটু। পোখ-এর সঙ্গে অন্য যে যাত্রীটি ছিলো, আপনারা যার হদিশ চাচ্ছেন, যাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ হচ্ছে, তাকেও কিন্তু আমি চিনি।

তুমি তাকে চেনো?

হ্যাঁ। আর এই যাত্রীটি যদি সত্যি খুন করে থাকে...

তদন্ত করে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহই নেই যে ঐ লোকটাই খুনে।

এক্ষুনি তার নাম আপনাকে বলে দিতে পারি কিন্তু আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন?

তুমি বললে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো।

আমি অবশ্য তাকে স্বচক্ষে দেখেছি। য়েক তাকে আশ্বস্ত করলে, তার সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয়নি, তাছাড়া সে তার টুপির ডগা ভুরুর উপর নামিয়ে দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছিলো–কিন্তু চকিতের মধ্যে তাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম।

কে সে?

অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফ।

দিমিত্রি নিকোলেফ! মেজর ফেরডের একেবারে স্তম্ভিত। অসম্ভব– তা হতেই পারে না।

আমি তো বলেইছিলুম যে আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন মেজর, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, দিমিত্রি নিকোলেফ!

আগামী পৌরনির্বাচনে প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন দিমিত্রি, লোকে তাকে নির্বাচন করবেই, প্রবল ইয়োহাউজেন পরিবারের তিনি বিরুদ্ধ পক্ষ– জর্মান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্লাভ জাগরণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার তিনি মূর্ত প্রতীক– আর তিনি, সেই তিনি, কিনা অসহায়, নিরীহ গোবেচারা পোখ-এর হত্যাকারী!

য়েক-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মেজর, তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, তুমি শপথ করে বলছো?

হ্যাঁ, অন্তত সে-রাত্তিরে তিনি রিগায় ছিলেন না।... কিন্তু একটু খোঁজ-খবর করলেই তো সে-সম্বন্ধে জেনে নেয়া যাবে।

এক্ষুনি তার বাড়িতে লোক পাঠাচ্ছি, মেজর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, হের ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনকে আমার আপিশে আসতে খবর দিচ্ছি, তুমি এখানেই থেকো।

নিশ্চয়।

মেজর তক্ষুনি দুজন পুলিশকে ডেকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। দশ মিনিট যেতে না-যেতেই ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এসে হাজির। সারজেন্ট য়েক এবার তার সামনেই সব কথা খুলে বললে।

আবারও সারজেন্টকে জিগেশ করেন মেজর, এ কথা তুমি শপথ করে বলতে পারো?

নিশ্চয়ই, সারজেন্ট য়েক-এর গলায় কোনো দ্বিধা নেই।

কিন্তু উনি সম্ভবত রিগা ছেড়ে যাননি,ইয়োহাউজেন আপত্তি তুললেন।

নিশ্চয়ই গেছেন, য়েক বললে, অন্তত চোদ্দ তারিখ রাত্তিরে উনি বাড়ি ছিলেন না, কারণ আমি ওঁকে ক্রোফ-এর সরাইতে দেখেছি নিজের চোখে দেখেছি... ওঁকে চিনতে আমার ভুল হবার কথা নয়...

মেজর ফেরডের বললেন, একটু বসুন, হের ইয়োহাউজেন। আমি ওঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়েছি। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে খবর নিয়ে আসবে।

জানলার ধারে বসে আছেন ইয়োহাউজেন, চুপচাপ ও গম্ভীর, তার মনের মধ্যে আবেগের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। সারজেন্টের কথাই সত্যি হোক, প্রমাণ হোক যে য়েক কোনো ভুল করেনি, এই ইচ্ছা তার একেবারে বুকের ভিতরে তীব্রভাবে হুলুস্থুল বাধাচ্ছে, কিন্তু তবু কেন যেন তার অন্তরাত্মা বলছিলো এ-কথা সত্যি নয়, দিমিত্রি নিকোলেফ তার পরম শত্রু হতে পারেন, কিন্তু হত্যাকারী তিনি নন– খুনে নন, জল্লাদ নন– তাঁর সততা ও মর্যাদা তর্কাতীত।

ইয়োহাউজেনের সংবিৎ ফিরলো সংবাদদাতার কণ্ঠস্বরে : তেরো তারিখ ভোরবেলা দিমিত্রি নিকোলেফ রিগা ছেড়ে চলে গেছেন, কোথায় গেছেন কেউ জানেনা– এখনও তিনি ফিরে আসেননি।

সারজেন্ট য়েক-এর বিবৃতিই তবে সত্যি!

ইয়োহাউজেন যখন পুলিশ দপ্তর থেকে বেরুলেন তখন তিনি যুগপৎ অভিভূত ও উল্লসিত।

বারুদের স্তূপের মধ্যে আগুনের ফুলকির মতো এই ভীষণ খবর দেখতে না দেখতে গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়লো।

তাহলে দিমিত্রি নিকোলেই পোখ-এর হত্যাকারী!

+

ইলকা নিকোলেফের কাছে এ-খবর ভাগ্যিশ পৌঁছোয়নি! ডাক্তার হামিনেই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যাতে কোনো গুজব বা জনরব ও বাড়ি না পৌঁছোয়। কিন্তু সন্ধেবেলায় তার বসার ঘরে যখন অভিভূত ও বিমূঢ় মঁসিয় দ্যলাপোর্তের আগমন হলো, তখন তারা পরস্পরের দিকে মুখ তুলেই তাকাতে পারছিলেন না। অ্যাঁ, দিমিত্রি নিকোলেফ নরহন্তা!... অসম্ভব!

কিন্তু ততক্ষণে বেতারে সবখানে খবর পৌঁছে গিয়েছে। সারা তল্লাটের পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ততক্ষণে। দিমিত্রি নিকোলেফকে দেখবামাত্র যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

ষোলো তারিখ বিকেলে এই খবরই গিয়ে পৌঁছেছিল ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে। খবরটা প্রথম জেনেছিলো কার্ল ইয়োহাউজেন– কাজেই প্রকাশ্যে, জাঁ নিকোলেফের সব বন্ধুবান্ধবের সামনে, ওইভাবে চরম আঘাত হানবার সুযোগ সে কিছুতেই হারায়নি।

.

১০. জেরা

দিমিত্রি নিকোলেফ রিগা ফিরে এলেন ১৬ই এপ্রিল রাতে; ফেরবার সময়ও কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

অস্বস্তিতে ভুগছিলো বলে ইলকা তখনও ঘুমোয়নি– ঘুমুতে পারেনি। তাও তো বেচারি জানে না কী ভয়ংকর অভিযোগ খড়্গের মতো তার বাবার মাথার উপর ঝুলছে! কিন্তু তা না-জানলেও তার দুর্ভাবনার কোনো ইয়ত্তা নেই। সন্ধেবেলা মঁসিয় দ্যালাপোৎ আর ডাক্তার হামিনে যখন খোঁজখবর নিয়ে চলে গেলেন, তখনই ডোরপাট থেকে এক তারবার্তা এসে হাজির; কোনো কারণ উল্লেখ না করেই তাতে এই বার্তা ছিলো যে জাঁ নিকোলেফ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছুঁড়ে রিগা চলে আসছে কালকেই।

সকালবেলায় ইলকার মনের ভাব অবিশ্যি অনেকটাই কমে গেলো যখন সে সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ পেলে। রাত্তিরে যে কখন বাবা এসে পৌঁছেছেন, তা সে জানতেও পারেনি।

মেয়েকে দেখেই নিকোলেফ বললেন, এত দেরি হবে তা আগে বুঝতে পারিনি... যাক ফিরে তো এলুম অবশেষে...

তোমাকে ভারি ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বাবা।

তা একটু ক্লান্ত লাগছে সত্যি। এ-বেলা জিরিয়ে নিলেই হবে। বিকেলে আবার জরুরি ক্লাস আছে নিতে হবে।

কাল ক্লাস নিলে হয় না? তোমার ছাত্রদের তো আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

না, ইলকা, না। খামকা ওদের ক্লাস না নেবার কোনো মানে হয় না। আমার তো আর অসুখবিসুখ কিছু করেনি। ... কেউ এসেছিলো এর মধ্যে খোঁজ নিতে?

না, শুধু মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ আর ডাক্তার হামিনে এসেছিলেন। তোমাকে না-দেখে তাঁরা ভারি অবাক হলেন।

নিকোলেফ একটু ইতস্তত করে বললেন, কেবল তো দু-এক দিনের মামলা... সেই জন্যেই ওঁদের কিছু বলিনি।

তুমি কি ডোরপাট গিয়েছিলে, বাবা? হঠাৎ কালকের তারবার্তাটির কথা মনে পড়ে গেলো ইলকার।

ডোরপাট? নিকোলেফ অবাক হলেন, কেন? হঠাৎ ডোরপাটের কথা কেন?

কাল জাঁ এক তার পাঠিয়েছে– আজকে নাকি রিগা এসে পৌঁছুবে। বাস, এছাড়া তাতে আর কোনো খবর নেই।

জাঁ আসছে? সত্যি, ভারি আশ্চর্য তো! হঠাৎ ফিরে আসছে কেন? কী জানি, হঠাৎ কোনো জরুরি কাজ পড়েছে হয়তো।

নিকোলেফ বুঝতে পারছিলেন তার কন্যা তার আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে খুবই কৌতূহলী হয়ে আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্যই তিনি করলেন না। চায়ের টেবিলে বসে অন্যান্য বিষয়ে হালকা কথাবার্তা হলো। তারপর তিনি পড়ার ঘরে চলে গিয়ে ক্লাসের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

আবার যথারীতি শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে গৃহকর্ম চলতে লাগলো। কিন্তু এই শান্তি যে ঝড়ের আগেকার স্থিরভীষণ থমথমে ভাব, সেটা ইলকা স্বপ্নেও ভাবতে পারলে না।

ঝড় উঠলো সোয়া-বারোটায়।

কোতোয়ালি থেকে এলো এক পুলিশের লোক, ভৃত্যের হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়ে বললো এটা এক্ষুনি কর্তার কাছে পৌঁছে দিতে। নিকোলেফ বাড়ি আছেন কি না তা পর্যন্ত সে জিগেশ করলে না। এমনিতে বাইরে থেকে দেখে বোঝবার জো না থাকলেও আসলে রাত থেকেই এ বাড়ির উপর কড়া পুলিশ পাহারা বসেছিলো। চিঠির বয়ানটা সংক্ষিপ্ত; কোনো ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি তাতে লেখা ছিলো :

অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফের কাছে বিচারপতি কেরস্টোফের অনুরোধ, অধ্যাপক নিকোলেফ যেন পত্রপাঠ কেরস্টোফের আপিশে এসে দেখা করেন। বিষয়টা খুবই জরুরি।

নিকোলেফ চিঠি পেয়ে সত্যি খুব অবাক হলেন। কেমন যেন পাংশু হয়ে গেলো তাঁর মুখ, কেমন-একটা অস্থির দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠলো চোখেমুখে। একবার ভেবেছিলেন এই

পরোয়ানা বা এত্তেলাকে মোটেই পাত্ত দেবেন না; কিন্তু শেষটায় কী ভেবে তলব অনুযায়ী কাজ করলেন তিনি, টপকোট গায়ে চাপিয়ে নিচে নেমে এলেন। বললেন, ইলকা, এক্ষুনি একবার জজ কেরস্টোফের আপিশে যেতে হবে। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

জজ কেরস্টোফ? কেন? হঠাৎ আবার তোমাকে তার কী দরকার?

জানি না, দিমিত্রি নিকোলেফের মুখ কেমন বিবর্ণ দেখালো।

এর সঙ্গে জাঁ-র কোনো সম্বন্ধ নেই তো? ওকে হঠাৎ ডোরপাট ছাড়তে হলো কেন, বুঝতে পারছি না।

জানি না... কিছু তো বুঝতে পারছি না... হতেও পারে, ওর সঙ্গে জাঁ কোনোভাবে জড়িত। যাই হোক, কী ব্যাপার এক্ষুনি জানতে পারবো।

আদালতে পৌঁছনো মাত্র তাঁকে জজ কেরস্টোফের আপিশে নিয়ে যাওয়া হলো। কেরস্টোফের সঙ্গে ঘরে বসে ছিলেন মেজর ফেরডের আর কেরস্টোফের কেরানি। প্রথমে নমস্কার বিনিময় করলেন তাঁরা, তারপর ঘরে কী-রকম একটা বিশ্রী অস্বস্তিকর স্তব্ধতা নেমে এলো। নিকোলেফ চাচ্ছিলেন, কেন তাকে হঠাৎ ডেকে পাঠানো হলো, তা খুলে বলা হোক।

মঁসিয় নিকোলেফ, কেরস্টোফ শুরু করলেন, একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আপনার কাছ থেকে কতগুলো খবর জানতে চাই।

কী ব্যাপার বলুন তো? নিকোলেফ জিগেশ করেন।

দাঁড়িয়ে কেন, বসুন বসুন।

নিকোলেফ একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন–ঠিক কেরস্টোফের মুখোমুখি। মেজর ফেরডের জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। জেরা শুরু হলো।

দিমিত্রি নিকোলেফ, কেরস্টোফ আগেই সাবধান করে দিলেন, প্রশ্ন শুনে চমকে যাবেন না। হয়তো এ-সব প্রশ্ন আপনার কাছে একান্ত ব্যক্তিগত ঠেকবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের খাতিরে, এবং আপনার নিজের খাতিরেও, আশা করবো আপনি সব প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর দেবেন..... কোনো কথা চেপে যাবেন না।

নিকোলেফ একদৃষ্টে জজ কেরস্টোফের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সব কথা তার কানে গেছে কি না, বোঝা গেলো না। হাত দুটো ভাঁজ করা, মুখে কোনো কথা নেই, চুপচাপ তিনি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কেরস্টোফের সামনে টেবিলের উপর খুনের মামলার সব নথিপত্র। গম্ভীর গলায় তিনি জিগেশ করলেন, আপনি কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কবে রিগা ছেড়েছিলেন?

তেরো তারিখ ভোরবেলায়।

ফিরলেন কবে?

কাল রাত্তিরে–একটা নাগাদ।

একা গিয়েছিলেন? না কি সঙ্গে আর কেউ ছিলো?

একাই গিয়েছিলুম।

রেফেলে যাবার ডাকের গাড়িতে উঠেছিলেন বুঝি?

একটু ইতস্তত করে নিকোলেফ বললেন, হ্যাঁ।

ফিরলেন কীসে?

তেলেগ্যুতে।

কোত্থেকে নিয়েছিলেন তেলেগ্যু?

এখান থেকে পঞ্চাশ ভেস্ট দূরে হবে–রিগার রাস্তায়।

তাহলে, ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে আপনি তেরো তারিখ সকালে রিগা থেকে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সকাল ছটায়।

কোচবাক্সে কি একাই যাত্রী ছিলেন আপনি?

না... আরেকজন যাত্রী ছিলেন।

তাকে আপনি চেনেন?

না, আগে তার কথা কখনও শুনিনি।

কিন্তু এটা নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে দেরি হয়নি যে যাত্রীটির নাম পোখ–ইয়োহাউজেনদের ব্যাঙ্কের তিনি হরকরা?"

তা দেরি হয়নি। ভদ্রলোক অবিশ্রাম কথা বলছিলেন কণ্ডাক্টরের সঙ্গে।

ব্যক্তিগত বিষয়েও কথা বলছিলেন?

ব্যক্তিগত বিষয়েই বলাবলি করছিলেন।

কী বলছিলেন তিনি?

যে তিনি ইয়োহাউজেনদের কী-একটা কাজে রেফেল যাচ্ছেন।

রিগায় ফেরবার জন্য অধীর তো হননি ভদ্রলোক?... মানে তার তো বিয়ের কথা ছিলো।

হ্যাঁ। ... আসলে আমি ওসব কথাবার্তায় বিশেষ মনোযোগ দিইনি– টুকরো-টুকরোভাবে কথাগুলো আমার কানে আসছিলো। আমার তো আর ওঁর সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল ছিলো না।

এবার মেজর ফেরডের মাঝখানে একটা টিপ্পনী কাটলেন : সত্যি ছিলো না?

একটু অবাক হয়ে ফেরডেরের দিকে তাকালেন নিকোলেফ। মোটেই না। ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমার কৌতূহল থাকবে কেন?

হয়তো এই তদন্ত মারফৎ আমরা তা-ই জানবার চেষ্টা করছি, বললেন কেরস্টোফ।

নিকোলেফকে সত্যি ভারি বিমূঢ় ও অসহায় দেখালো।

কেরস্টোফ বললেন, পোখ-এর কাছে একটা ব্রীফ-কেস ছিলো না? ব্যাঙ্কের লোকেরা যাতে টাকাকড়ি রাখে, সে-রকম একটা ব্রীফ-কেস?

হতে পারে, তবে আমি ভালো করে খেয়াল করিনি। আমি এক কোনায় ওভারকোট মুড়ি দিয়ে বসেছিলুম–মাঝে মাঝে টুপিটা মুখের উপর নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়েও পড়ছিলুম। কাজেই কে কী করছে না-করছে, বা কার সঙ্গে কী আছে না-আছে, সে সব মোটেই লক্ষ করিনি।

হ্যাঁ, ব্রোক্সও তা-ই বলেছে। ফেরডের বললেন।

আপনি পোখ-এর সঙ্গে কোনো কথা বলেননি? কেরস্টোফ জিগেশ করলেন।

গাড়ি চলবার সময় আমাদের কোনো কথা হয়নি। ... দুর্ঘটনার পরে সরাইখানায় যাবার সময় তার সঙ্গে আমি প্রথম কথা বলি– তাও সরাইয়ে যাবার জন্যই।

তাহলে সাবধানে টুপির ডগায় মুখ ঢেকে সারাদিন আপনি কোচবাক্সের কোনায় বসেছিলেন?

সাবধানে!–এ-কথার মানে? নিকোলেফ কথাটার মর্মার্থ পুরোটা ধরতে না-পারলেও রূঢ় ইঙ্গিতটা তার অগোচর ছিলো না।

অর্থাৎ বর্ণনা থেকে মনে হয় কেউ আপনাকে চিনে ফেলুক, এ-ইচ্ছে আপনার ছিলো না। আবারও এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যটি করলেন মেজর ফেরডের।

নিকোলেফ এবার এ-ইঙ্গিতটি অগ্রাহ্য করলেন না। শুধু বললেন, যদি ধরেও নিই যে কেউ আমাকে চিনে ফেলুক এ-ইচ্ছে আমার ছিলো না, তাতে কি কিছু বেআইনি কাজ করা হলো! আমার ধারণা ছিলো পৃথিবীর সবখানেই এমনকী লিভোনিয়াতেও এই অধিকার লোকের আছে।

হ্যাঁ, কোনো সাক্ষীশাবুদ না-রাখার জন্য এটা যে একটা চমৎকার অধিকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই, রূঢ়ভাবে বললেন মেজর ফেরডের।

এই বিশ্রী মন্তব্যটি শোনবামাত্র নিকোলেফ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেলেন। কী-একটা বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন।

কেরস্টোফ বললেন, পোখ যে সেদিন আপনার সহযাত্রী ছিলো, এ-কথা আপনি তাহলে অস্বীকার করছেন না।

না, সেদিন পোখ আমার সঙ্গে কোচবাক্সে ছিলেন।

কেরস্টোফ জেরা চালিয়েই গেলেন : কোচবাক্সটি সেদিন গোড়ার দিকে ভালোই যাচ্ছিলো... কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটেনি... দুপুরবেলায় কেবল মধ্যাহ্নভোজের জন্য আধঘণ্টা থেমেছিলো ডাকগাড়ি... তখনও আপনি চাননি যে কেউ আপনাকে চিনে ফেলুক। তারপর আবার ডাকগাড়ি রওনা হলো, আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হতে লাগলো, ঝড়ের মধ্যে এগুনোই কঠিন ঠেকতে লাগলো... সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ দুর্ঘটনাটা ঘটলো... একটা ঘোড়া পড়ে গেলো, গাড়ি গেলো উলটে, ভেঙে গেলো তার...

নিকোলেফ বাধা দিয়ে বললেন, কেন আপনি এ-সম্বন্ধে আমাকে জেরা করছেন, তা কি আমি জানতে পারি?

ন্যায়বিচারের জন্য, মঁসিয় নিকোলেফ। ...ব্রোক্স যখন বুঝতে পারলে যে এই ভাঙা গাড়ি নিয়ে পেরনাউ অবধি পৌঁছোনো যাবে না, তখন রাতটা একটা সরাইতে কাটানোই ভালো বলে সাব্যস্ত হলো। দুশো গজ দূরের সরাইটার দিকে প্রথম আপনিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সেদিন সন্ধেবেলায় সরাইটায় প্রথম আমি পদার্পণ করি। তার কথা আগে জানতুমই না।

একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্রোক্স ও সহিসের সঙ্গে পেরনাউ–গিয়ে সরাইটাতেই রাত কাটানো ঠিক করেছিলেন আপনি।

ও-রকম দুর্যোগের মধ্যে পথে কষ্ট পাবার চেয়ে সরাইটাতেই রাত কাটানো ভালো বলে মনে হয়েছিলো আমার।

আপনিই পোখকে ঐ সরাইতে রাত কাটাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন?

আমি তাকে কোনো পরামর্শই দিইনি। দুর্ঘটনার ফলে তিনি জখম হয়েছিলেন–পায়ে চোট লেগেছিলো– ও-অবস্থায় ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে তার পেরনাউ যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভাগ্যিশ সরাইটা কাছে ছিলো...

ভাগ্যিশ! মেজর ফেরডের নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না।

দিমিত্রি নিকোলেফ কেবল কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন।

কেরস্টোফ কিন্তু পুরো জেরাটা আগেই ছকে রেখেছিলেন। তিনি ছকটা নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। তাই তক্ষুনি তিনি জিগেশ করলেন, ব্রোক্সরা পেরনাউ রওনা হয়ে যাবার পর আপনারা ভাঙা-ক্রুশে এসে পৌঁছোন, তাই না?

ভাঙা ক্রূশ! সরাইটার নাম যে ভাঙা ক্রূশতা আমি এই প্রথম শুনলুম। পোখকে নিয়ে সরাইতে পৌঁছোবার পর আপনি সরাইওলা ক্রোফের কাছে রাত্রিবাসের জন্য একটা ঘর চাইলেন... পোখও তার জন্য একটা ঘর চেয়েছিলেন... ক্রোফ যখন জিগেশ করলো কিছু

খেতে চান কি না, তখন আপনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পোখ কিন্তু নৈশভোজনে বসেছিলেন...

আমার খিদে ছিলো না।

পরদিন ভোরবেলায়, কোচবাক্সের লোকজন ফেরবার আগেই, আপনি বেরিয়ে পড়তে চান, ক্রোফকে এ-কথা জানিয়েই আপনি আপনার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন।

এ-সব অর্থহীন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি যে তাঁকে ক্লান্ত করে তুলেছে, নিকোলেফ তা গোপন করলেন না। বললেন, হ্যাঁ, তা-ই হয়েছিলো।

খাবারঘরের বাঁদিকের ঘরটা আপনাকে দেয়া হয়েছিলো ঘরটা ছিলো সরাইখানার একেবারে এককোনায়...

আমার পক্ষে তো এসব তথ্য সঠিক জানা সম্ভব নয়... আগেই তো বলেছি। সেদিনই আমি ওখানে প্রথম পদার্পণ করি... তাছাড়া আমরা যখন সরাইটায় পৌঁছোলুম তখন অন্ধকার করে এসেছিলো, আমি যখন ওখান থেকে রওনা হই, তখনও আলো ফোটেনি...

ভাঙচুর সারিয়ে কোচবাক্স চলতে শুরু করা অব্দি আপনি অপেক্ষা করতে চাননি, কেরস্টোফ আবারও প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন।

যেতে চাচ্ছিলুম পেরনাউ ওখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তাই খামকা আমার অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয়নি।

বেশ। সন্ধেবেলাতেই পরিকল্পনাটা আপনার মাথায় এসেছিলো আর সাতসকালেই সেটা আপনি কাজে খাঁটিয়ে ফেললেন।

নিকোলেফ কোনো কথা না-বলে চুপ করে রইলেন।

কেরস্টোফ বললেন, এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে-চাই। আশা করি । তার সদুত্তর দিতে আপনার আপত্তি হবে না...

বলুন।

হঠাৎ হুড়মুড় করে এ-ভাবে যাবার তাড়া পড়লো কেন আপনার? অত গোপনীয়তাই বা কেন ছিলো?

এই প্রথম নিকোলেফকে ইতস্তত করতে দেখা গেলো। ও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

জানতে পারি কি, কী এমন ব্যক্তিগত...

এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।

অন্তত এটা কি বলবেন আপনার গন্তব্য কোথায় ছিলো?

এ-সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার নেই।

রেফেল যাবার জন্য ভাড়া দিয়েছিলেন আপনি। কোথায় যেতে চাচ্ছিলেন? রেফেলেই?

কোনো উত্তর নেই।

পেরনাউ যেতে চাচ্ছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ কোচবাক্স মেরামত অব্দি আপনি অপেক্ষা করেননি। তবে কি পেরনাউ যেতে চাচ্ছিলেন?

দিমিত্রি নিকোলেফ এবারও চুপ করে রইলেন।

শেষবারের মতো জিগেশ করছি। আপনার যাত্রার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য কী ছিলো...

ঠাণ্ডাগলায় নিকোলেফ বললেন, এ-সব জেরার উদ্দেশ্য কী, জানি না। কেনই বা এভাবে আপনার আপিশে আমায় ডেকে এনেছেন, তাও আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। কিন্তু তবু এতক্ষণ আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে যদিও আমি সেদিন যাবার সময় লোকের চোখে পড়তে চাইনি তবুও আপনি জিগেশ করবামাত্র সব স্বীকার করেছি। আপনিও তো বললেন আমাকে কেউ চিনতো না বা চিনতে পারেনি। কাজেই আমি যদি সব অস্বীকার করতুম, তাহলে আপনি প্রমাণ করতেন কী করে যে আমিই সেদিন কোচবাক্সে ছিলুম...

একজন সাক্ষী কিন্তু আছেন, মঁসিয় নিকোলেফ, যিনি আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন...

একজন সাক্ষী আছেন?

হ্যাঁ, আপনি এক্ষুনি তার নিজের মুখ থেকে সব কথা জানতে পারবেন। বলে কেরস্টোফ একজন পুলিশকে ডেকে বললেন, সারজেন্ট য়েক-কে পাঠিয়ে দাও।

মুহূর্তের মধ্যে সারজেন্ট য়েক ঘরে ঢুকে তার বড়কর্তাকে অভিবাদন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

আপনিই ষষ্ঠ স্কোয়াড-এর সারজেন্ট য়েক?

সারজেন্ট তার পরিচয় দিলে। নিকোলেফ কিন্তু সারজেন্টকে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছেন বলে মনেই করতে পারলেন না।

গত তেরোই এপ্রিল সন্ধেবেলায় আপনি কোথায় ছিলেন? ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায়?

হ্যাঁ, পেরনাওয়া থেকে একটা অভিযান সেরে ফিরছিলুম আমি... ফেরবার সময় ঐ সরাইতে ঢুকে খানিকক্ষণ আমরা বিশ্রাম করি। ঘণ্টা দুই ছিলুম ওখানে। তারপর যখন পেরনাউ রওনা হবার জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় সরাইয়ের দরজা খুলে দুই ব্যক্তি এসে ঢোকেন। তারা যে-কোচবাক্সে যাচ্ছিলেন, তা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ায় তারা সরাইখানায় আশ্রয় নিতে চাচ্ছিলেন। যাত্রীদের একজন ছিলেন পোখ, তাকে আমি আগে থেকেই চিনতুম। অন্য যাত্রী তাঁর ওভারকোটের কলারে নিজের মুখ ঢেকে রাখতে চাচ্ছিলেন, কেউ যে তাঁকে চিনুক এটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। এতে সন্দিগ্ধ হয়ে আমি তার পরিচয় পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠি। তার পরে এক ঝলকের জন্য যখন তার মাথার টুপিটা সরে যায়, তখন তাঁর মুখ দেখতে পাই আমি কারণ আমি সর্বক্ষণ তার দিকেই তাকিয়েছিলুম।

ঐ এক ঝলকেই তাকে চিনতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ। ভদ্রলোককে আমি অনেকবার রিগায় দেখেছি।

এবং তিনি হলেন অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলে?

হ্যাঁ, তিনি এ-ঘরে বসে আছেন এখন, দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণ নিকোলেফ সব কথা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, সারজেন্ট ঠিকই বলেছেন। উনি সম্ভবত সরাইতেই ছিলেন তখন। তিনি আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে থাকলেও তাঁর সম্বন্ধে কিন্তু আমার কোনো কৌতূহলই ছিলো না। তাছাড়া, আমি তো নিজেই আপনাদের বলেছি যে সে রাতে আমি ঐ সরাইটায় ছিলুম– কাজেই এই সাক্ষীশাবুদের দরকার কেন, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কেন তা আপনি শিগগিরই জানতে পারবেন, দিমিত্রি নিকোলেফ। হঠাৎ গোপনে আপনাকে যেতে হয়েছিলো কেন, আপনি তাহলে তা বলতে চাচ্ছেন না!

না।

আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনার এই অস্বীকৃতির ফল আপনার পক্ষে ভালো হবে না!

তার মানে?

সে-রাত্রে ঐ সরাইটায় কী হয়েছিলো, তা খুলে বললে অনেক ঝামেলা বাঁচতো। আপনি যদি আপনার গতিবিধির একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন, তাহলে আর আমাদের এভাবে তদন্ত করতে হতো না।

কেন? সে রাত্রে কী হয়েছিলো?

আপনি জানেন না?

না, এবার নিকোলেফের কণ্ঠস্বরে একটু অস্বস্তি প্রকাশ পেলো, এটা বুঝতে পারছি যে একটা গুরুতর ব্যাপারে আমি বোধহয় জড়িয়ে পড়েছি এবং আপনারা আমাকে সাক্ষ্য দিতে ডেকে এনেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, তা-ই তো বুঝতে পারছি না।

সাক্ষ্য দিতে ডেকেছি আপনাকে? না, দিমিত্রি নিকোলেফ, না। আপনাকে ডাকা হয়েছে অভিযুক্ত আসামী হিশেবে!

কীসের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে?

তেরো তারিখ রাত্তিরে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় পোখ খুন হয়েছে।

বেচারি খুন হয়েছে!

হ্যাঁ। এবং আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে খুনী হচ্ছে তার ভ্রমণ-সঙ্গী–অর্থাৎ আপনি।

আমি! খুনী! দিমিত্রি নিকোলেফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি তাহলে অভিযোগ অস্বীকার করছেন? কেরস্টোফও উঠে দাঁড়ালেন আস্তে-আস্তে।

কতগুলো কথা আছে যাদের আর অস্বীকার করতে হয় না শোনবামাত্রই বোঝা যায় তারা সত্যি নয়।

আপনি সতর্ক হয়ে কথা বলবেন...

পাগল! আপনারা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন?

আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েই কথাটা বলছি...

দিমিত্রির গলার স্বরে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো, এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো তর্ক নেই। কেবল শুনি, কোন্ প্রমাণের বশবর্তী হয়ে আপনারা আমাকে খুনী সাব্যস্ত করেছেন?

আপনি সে-রাতে যে-ঘরে ছিলেন তার জানলার গোবরাটে কতগুলো দাগ দেখে বোঝা গেছে যে জানলা দিয়ে পোখ-এর ঘরে ঢোকবার জন্য আততায়ী জানলাটা ব্যবহার করেছিলো। যে-হাতুড়িটা দিয়ে জানলার খড়খড়ি ভেঙে আততায়ী ঢুকেছিলো, সেটাও আপনার ঘরে পাওয়া গেছে।

হুঁ... এ-সব প্রমাণ থেকে অবিশ্যি সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়– আপনাদের দোষ নেই। কিন্তু ধরেই নিলুম বাইরের কোনো লোক সে-রাতে খুন করেনি–কিন্তু আমি চলে যাবার পরেও তো খুনটা হতে পারত?

অর্থাৎ আপনি সরাইওলাকে অভিযুক্ত করছেন। কিন্তু তদন্তে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আমি কাউকেই অভিযুক্ত করছি না, দিমিত্রির গলার স্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কেউ কী করে ভাবতে পারলো আমার দ্বারা ও-রকম কোনো হত্যাকাণ্ড সম্ভব!

এবার মেজর ফেরডের বললেন, খুনীর উদ্দেশ্য ছিলো চুরি। ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সদের টাকা নিয়ে যাচ্ছিলো পোখ– অথচ এর ব্রীফকেসে কোনো টাকা পাওয়া যায়নি।

তো আমার তাতে কী?

এবার কেরস্টোফ আবার জিগেশ করলেন, দিমিত্রি নিকোলেফ, আপনি এখনও আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্যও খুলে বলবেন না আমাদের?

না।

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই অভিযোগ কেমন গুরুতর। অন্য-কেউ হলে এই সাংঘাতিক কাণ্ডের জন্য তাকে আমরা গ্রেফতার করতুম কিন্তু আপনার মতো লোক, যাঁকে দেশশুদ্ধ সবাই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তাকে সাধারণ কয়েদির মতো হাজতে পুরে রাখা যায় না। আমি আপাতত আপনার গ্রেফতারি পরোয়ানায় দস্তখৎ দিচ্ছি না... কিন্তু

সবসময়েই তৈরি থাকবেন- যাতে তদন্তের এত্তেলা পাঠালেই আপনাকে পাওয়া যায়। আর তদন্তের জন্য মাঝে-মাঝেই আপনাকে আমাদের দরকার হবে।

মুখোমুখি

১১. মুখোমুখি

অন্য অনেকের মতোই–মেজর ফেরডেরের ইচ্ছে ছিলো–যে জেরার পর যেন দিমিত্রিকে গ্রেফতার করা হয়। বিশেষ করে দিমিত্রির প্রবল জেদ–কিছুতেই তিনি তার রহস্যময় ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গন্তব্যস্থলের কথা যখন খুলে বলবেন না– সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দিলে।

তাহলে কেন নিকোলেফকে গ্রেফতার করা হলো না? হাজতে পুরে ধোলাই দেবার বদলে কেন তাকে স্বাধীনভাবে বাড়ি চলে যেতে দেয়া হলো? বলা হয়েছে অবশ্য যে এত্তেলা পাঠালেই তিনি যেন কেরস্টোফের আপিসে এসে হাজির হন, কিন্তু এই সুযোগে তিনি তো পালিয়ে যেতেও পারেন।

রুশদেশে, বা অন্যত্রও, বিচারবিভাগের স্বাধীনতায় এমনিতে হাত দেয়া হয় না। কিন্তু অভিযোগ যেই কোনো রাজনৈতিক চেহারা নেয়, অমনি উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের আবির্ভাব ঘটে। দিমিত্রি নিকোলেফের মামলাটাই তার একটা দৃষ্টান্ত : যখন স্লাভরা তাকে নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্যে তোড়জোড় করছে, ঠিক তক্ষুনি তাঁর বিরুদ্ধে এই ভীষণ অভিযোগ উত্থাপিত হলো। সেইজন্যেই আসলে বলটিক প্রদেশের রাজ্যপাল জেনারেল গোরকো তাকে গ্রেফতার করাটা সমীচীন বোধ করেননি–যখন একেবারে অকাট্যভাবে তার অপরাধ প্রমাণিত হবে, তখনই তাকে সাজা দেবার জন্য সোপর্দ করা হবে। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কেরস্টোফের উপরও তার গভীর আস্থা ছিলো। কেরস্টোফের মর্যাদাবোধ,

মুক্তদৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব ও বিবেক তাকে সারা দেশেই শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলো। কোনো রাজনৈতিক মতবাদ তাকে কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

কিন্তু শহরে ততক্ষণে বিষম সাড়া পড়ে গেছে। বেশির ভাগ লোকেই ভেবেছিলো এবং তাদের মধ্যে প্রভাবশালী ধনাঢ্যদের সংখ্যাও অল্প ছিলো না– যে, দিমিত্রি নিকোলেফকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাই যখন তাকে স্বাধীনভাবে বাড়ি ফিরতে দেখা গেলো, তখন কোনো-কোনো মহলে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হলো।

তাছাড়া এই বিষম বার্তা ততক্ষণে গিয়ে নিকোলেফ ভবনেও পৌঁছেছে। ইলকা এতক্ষণে জানতে পেরেছে যে কোনো ভয়ংকর অভিযোগের খড়গ তার বাবার মাথার উপর ঝুলছে। তার ভাই জাঁ এসে পৌঁছেছে বাড়িতে ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডগোলের কথাও সে সবিস্তারে খুলে বলেছে দিদিকে। বাবা যে স্বপ্নেও কখনও এ-রকম নৃশংস কাজ করতে পারেন না, এ-বিষয়ে তাদের মনে কোনো সংশয় নেই। সংশয় নেই ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্তের মনেও। খবরটা শোনবামাত্র তারা গিয়ে হাজির হয়েছেন নিকোলেফ ভবনে, এবং ভাইবোনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তাদের বক্তব্য হলো, নিকোলেফকে কে না চেনে রিগায়, কে না তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, কাজেই অভিযোগ তুললেই তো হলো না তাকে প্রমাণ করা চাই, আর সেক্ষেত্রে তার নিষ্কলুষ অতীত জীবনের স্মৃতি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

দিমিত্রি নিকোলেফ বাড়ি ফিরে দেখলেন তার ছেলেমেয়ে ও বন্ধুরা সম্মিলিত হয়ে আছেন বিশ্বাসে অবিচল, বিচারে আস্থাশীল অন্যায় ও আজগুবি অভিযোগের প্রতিবাদে উন্মুখর। বাইরে কিন্তু তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকদের ভিড় ও কোলাহল শুরু হয়ে

গেছে–বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক দল হিশেবে তারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাচ্ছে। কেরস্টোফের জেরার কথা খুলে বললেন নিকোলেফ, প্রশংসাও করলেন তিনি কেরস্টোফকে তার মন ভোলা, দৃষ্টি স্বচ্ছ কিন্তু মেজর ফেরডের যে তাকে। হাজতে পোরবার জন্য উৎসুক ও বদ্ধপরিকর, তার এই ধারণাও তিনি সকলকে খুলে বললেন। কিন্তু সব কথা বলবার সময় কেমন ভাঙা-ভাঙা শোনালো তার গলা, কেমন যেন অবসন্ন দেখালো তাকে যেন এই অভিযোগের বিপুল আঘাতে তার মনের শান্তি ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছে। তার এখন বিশ্রাম চাই, এ-সব বাজে ব্যাপার মন থেকে মুছে ফেলা চাই– এ-কথা বুঝতে পেরে বন্ধুরা তখনকার মতো বিদায় নিলেন, যাবার আগে তারা বন্ধুর উপর আস্থা জানিয়ে গেলেন তাদের। বন্ধুকে এই অভাবিত বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য নানা শলাপরামর্শ করতে-করতে তারা গেলেন।

এটা তারা বুঝতে পারছিলেন যে নিকোলেফের শত্রুরা তাকে নির্দোষ বলে জানলেও রাজনৈতিক সুযোগগুলো নিতে ছাড়বে না। কোনো-কোনো মহলে উত্তেজনা ও ষড়যন্ত্র বেশ তীব্র চেহারা নেবে। কাজেই এ-ক্ষেত্রে আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করা চাই। না-হলে নিকোলেফের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা না-গেলে এবং আততায়ীকে খুঁজে বার করতে না পারলে, গুজবের বিষ ঝেড়ে ফেলা যাবে না। তাছাড়া জাঁ আর কার্ল-এর ব্যাপারটাও তারা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছিলেন না। জাঁকে তারা ছেলেবেলা থেকে চেনেন- সে কার্লকে কখনো ছেড়ে দেবে না, কার্ল-এর এই ইতর ও অন্যায় ব্যবহারের শোধ সে নেবেই। অথচ এখন এই অবস্থায় মাথা গরম করে কিছু করে ফেললেই ইয়োহাউজেনদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দেয়া হবে। ইশ, একবার যদি জানা যেতো দিমিত্রি কোথায় গিয়েছিলেন, কেন গিয়েছিলেন তাহলে অনেক রহস্য পরিষ্কার

হতো অনেক জট খুলে যেতো। কিন্তু কী বিষম তার জেদ এখনও তিনি পণ করে আছেন সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই খুলে বলবেন না।

এদিকে ইয়োহাউজেনদের মধ্যেও নানা শলাপরামর্শ হচ্ছে তখন। এটা তারা জানতেন যে নিকোলেফের সঙ্গে পোখ-এর কোনো পরিচয় ছিলে না। দৈবাৎ যদি নিকোলেফ জেনে থাকেন যে পোখ ব্যাঙ্কে কাজ করে, তাহলে সেই কোচবাক্সে এবং সেক্ষেত্রে এই হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত নয়, অতর্কিত। তাছাড়া নিকোলেফ যদি হত্যা ও চুরি দুই-ই করে থাকেন, তাহলে এটা নিশ্চয়ই তাঁর জানা নেই যে সব হচ্ছে নম্বরি নোট আর পোখ-এর চিরকেলে অভ্যাস নম্বরগুলো টুকে রাখা। সেক্ষেত্রে চোরাই টাকা খরচা করতে গেলেই তিনি ধরা পড়ে যাবেন, গলায় আঁটো হয়ে ফাঁস বসবে। কিন্তু, ধরা যাক, তিনি চুরি করেননি, খুনও না। সেক্ষেত্রেও তার রেহাই নেই। কারণ তার আর্থিক অবস্থা এখন বিষম শোচনীয়। যে-সব ঋণ ও লগ্নী আছে তাঁর, তা শোধ করবার ক্ষমতাই তার নেই। আর তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইয়োহাউজেনদের আঠারো হাজার রুবল তাকে ফেরৎ দিতে হবে, কিন্তু সে-টাকা জোগাড় করার মতো সামর্থ্য বা অবস্থা তার নেই। বলাই বাহুল্য, তিনি আরো কিছু সময় চাইবেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন স্থির করে ফেললেন, কিছুতেই তিনি সময় দেবেন না- কোনো দয়া দেখাবেন না–কেননা এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো যায় না। ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের স্বভাবটাই এ-রকম; নির্মম, দয়াহীন, উদ্ধত, প্রতিশোধপ্রবণ।

+

আঠারোই এপ্রিল কেরস্টোফ এলেন তল্লাশি পরোয়ানা নিয়ে, সঙ্গে মেজর ফেরডের ও সার্জেন্ট য়েক। নিকোলেফ ভবন তারা খুঁজে দেখতে চান– যদি চোরাই টাকার কোনো হদিশ মেলে।

দিমিত্রি নিকোলেফ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের দেখতে দিলেন সবকিছু কোনো প্রতিবাদ করলেন না; সব জিজ্ঞাসারই উত্তর দিলেন, ঘৃণা মিশিয়ে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। মেজর ফেরডের তার দেরাজ ঘাঁটলেন, আলমারি তাক তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখলেন, বাদ দিলেন না চিঠিপত্র, এমনকী হিশেবের খাতাও দেখতে ছাড়লেন না। আর এটা বুঝতে দেরি হলো না যে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনদের ধারণা মোটেই ভুল নয়– নিকোলেফ একেবারেই নিঃস্ব, কপর্দকশূন্য, শুধু ছাত্র পড়িয়েই কোনোক্রমে তার দিন চলে। কিন্তু এই অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন তার ছাত্ররাও টিকলে হয়।

তল্লাশি করে অবশ্য হত্যারহস্যের কোনো কিনারাই হলো না। তবে কোনো নিরাপদ গোপন জায়গায় চোরাই টাকা লুকিয়ে রাখার সময় তিনি বিস্তর পেয়েছেন–সরাই থেকে রাত থাকতেই তিনি যে কেটে পড়ে কোথায় গেলেন, সে-জায়গাটার খোঁজ পেলে হতো-সম্ভবত সেখানেই সব টাকা লুকোনো রয়েছে। নম্বরি নোট চালাতে গেলেই চোর ধরা পড়ে যাবে কিন্তু সে কি চট করে ও-টাকা চালাতে চাইবে! যখন নিজেকে সে নিরাপদ ও সন্দেহের অতীত বলে ভাববে, তখনই সে ও-টাকা চালাবার চেষ্টা করবে।

সারা বলটিক অঞ্চলে ততদিনে আলেমান প্রভাবের ফলে জনমত অধ্যাপক নিকোলেফের বিরুদ্ধে চলে গেছে। বেশির ভাগ লোকেই চাচ্ছে তাকে গ্রেফতার করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক, বিচার হোক। কেবল গরিব স্লাভরাই আছে তাঁর পক্ষে কিন্তু তাদেরও মনে

আছে খুঁতখুঁতুনি; খটকা তাদেরও কাটেনি। নিকোলেফ যে নিরপরাধ, এ-কথা তারা হলফ করে বলতে পারবে না। কিন্তু তিনি তো স্লাভ– কাজেই সমর্থন তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু তাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু, অর্থ ও সামর্থ্যই বা কই! ধনী জার্মানদের প্রভাব ও চেষ্টাকে ব্যর্থ করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই।

এতসব উত্তেজনার মধ্যে দিমিত্রি নিজে কিন্তু আছেন শান্ত ও অবিচল। কোনো কথাই তিনি বলতে চান না পারতপক্ষে, কারু সঙ্গেই না; সারাক্ষণ পড়ার ঘরে বসে থাকেন চুপচাপ। ছাত্রেরা পড়তে এলে রুটিনমাফিক পড়ান, ব্যাস, এই পর্যন্ত! শহরের উত্তেজনা দেখে বন্ধুরা তাকে বারণ করেছিলেন বাড়ি থেকে বেরুতে; তিনি শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যভরে তাদের সে-অনুরোধ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তার এই গুটিয়ে নেয়াটাকে সবাই বেশ একটু ভয় পেলেন। এটা বুঝতে কারু দেরি হলো না যে তার মনের উপর বিষম চাপ পড়ছে।

বলাই বাহুল্য, জাঁ তখনও ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরবার কথা ভাবতে পারছিলো না। যতদিন-না নিকোলেফের উপর থেকে সব সন্দেহ কেটে যায়, তদ্দিন ফেরবার কোনো কথাই ওঠে না। তাছাড়া কার্ল-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজেকে শামলে রাখবে কীভাবে। নিকোলেফ কেবল একটা খবরই মাঝে-মাঝে নিতেন–তার কোনো চিঠি এসেছে কি না। কিন্তু না, কোনো চিঠি নেই। ডাকহরকরা এসে অন্য-সব কাগজপত্র দিয়ে যায়, রোজ সে বিলি করে স্লাভদলের রাজনৈতিক মুখপত্র, কিন্তু না–কোনো চিঠি নেই। শেষ পর্যন্ত তাকে কেমন অধীর ও উত্তেজিত দেখাতে লাগলো। যেন একটা জরুরি চিঠি আসবার কথা– কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে সেটা আর আসছে না।

সেদিন পোখ-এর অন্ত্যেষ্টি। ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ সকালবেলাতেই এসে নিকোলেফ ভবনে হাজির হয়েছেন। শবাধারে করে পোখ-এর মৃতদেহকে নিয়ে গোরস্থানের দিকে শোকমিছিল যাবার সময় নিকোলেফদের বাড়ির বাইরে গোলযোগ হতে পারে, এই আশঙ্কা ছিলো তাদের। আগে থেকেই সেজন্য সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু ইলকা ও জাঁকে সাবধান করে দিলেও ব্যাপারটা দিমিত্রি নিকোলেফকে আগে থেকে জানানো তারা সমীচীন বোধ করেননি।

বাইরে আস্তে-আস্তে লোক জমছে। ভিড়, চ্যাঁচামেচি, বিশ্রী সব জিগির উঠছে। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে নিকোলেফ-ভবনের বাইরে। এরই মধ্যে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন তাঁরা, ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ শুদ্ধু। খাবার টেবিলে কোনো কথাই হলো না। শোকমিছিল সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই হলো না।

দেড়টা নাগাদ বাইরে যখন তুমুল হট্টগোল শুরু হলো, বোঝা গেলো শবাধার আসছে। সম্মিলিত চীৎকারে বাড়িটা শুদ্ধু থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ পড়ার ঘর থেকে দিমিত্রি বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এত হৈ-হল্লা কেন?

ডাক্তার হামিনে অনুরোধ করলেন, আপনার ঘরে চলে যান। বেরুবেন না। পোখ-এর আজকে অন্ত্যেষ্টি।

পোখ? মানে সেই লোকটা, যাকে আমি খুন করেছি!

ঘরে চলে যান নিকোলেফ, কাতর অনুরোধ করছি আপনাকে...

বাবা!ইলকা ও জাঁও অনুনয় করলো বাবাকে।

কিন্তু দিমিত্রি! তার মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, খুলতে চাইলেন জানলার পাল্লা।

না, দিমিত্রি, না। ও-কাজ করবেন না। এ নিছকই পাগলামি আপনার। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আমি দেখতে চাই। কেউ বাধা দেবার আগেই দিমিত্রি খোলা জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

হাজার কণ্ঠে চীৎকার উঠলো, খুন করো ওকে, খুন!

ঠিক সেই মুহূর্তেই, দৈবের কেমন যোগাযোগ, বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুলো শবাধার। পাশে আছে ভজেনাইদে পারেনসোফ, পরনে শোকার্ত বিধবার বেশ, কফিনে ফুল ও মালা। তারপর এলো ইয়োহাউজেনদের ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। তারপরে উন্মত্ত জনতা-যারা সমস্ত ব্যাপারটার সুযোগ নিতে চাচ্ছে। তুমুল হট্টগোলের মধ্যে শবযাত্রা থামলো বাড়ির মুখোমুখি। আর উঠলো অট্টরোল : খুনের বদলে খুন চাই।

মস্ত পুলিশবাহিনী নিয়ে কর্নেল রাগুয়েনোভ ও মেজর ফেরডের মোতায়েন ছিলেন বাড়ির কাছে। কিন্তু এই উন্মত্ত জনতা ঠেকাবে কে! পুলিশ! তাদের সাধ্য কী! তাছাড়া দিমিত্রিকে জানলায় দেখবামাত্র রোল উঠেছে, খুনের বদলে খুন চাই! খুনের বদলে খুন!

দিমিত্রি দাঁড়িয়ে রইলেন জানলায়, বুকে আড়াআড়ি ভাঁজ করা হাত, গর্বিত শির; যেন পাষাণমূর্তি, এমনি তিনি অবিচল ও নিশ্চুপ।

শবযাত্রা চলতে লাগলো আবার। চীৎকার উঠলো আরো চরমে, উন্মত্ততা আরো তুঙ্গে। ভিড় থেকে কেউ-কেউ ছুটে এলো বাড়ির দিকে, দরজা তারা ভেঙেই ফেলবে।

পুলিশ সামলে নিলে ব্যাপারটা তখনকার মতো কিন্তু এটা বুঝতে দেরি হলো না যে নিকোলেফকে এই খ্যাপা কুকুরের মতো জনতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাকে এক্ষুনি গ্রেফতার করতে হবে নইলে এক্ষুনি তাকে এই জনতা ছিঁড়ে ফেলবে।

পুলিশের সব চেষ্টা সত্ত্বেও জনতা বুঝি বেষ্টনী ভেদ করে এগুতো, যদি-না সেই মুহূর্তে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বময় এক যুবক। সে এসে ভিড় ঠেলে সোজা গিয়ে উঠলো সিঁড়িতে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সে থামতে বললো সবাইকে। ভিড়ের চীৎকার ছাপিয়ে শোনা গেলো সেই প্রবল নির্ঘোষ, থামো!

এমনি ব্যক্তিত্ব দৃঢ় তার ভঙ্গি যে হঠাৎ ভিড় গেলো পেছিয়ে, কোলাহল গেলো থেমে।

ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এগিয়ে গেলেন তার দিকে :কে আপনি?

মেজর ফেরডেরও প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন, আপনি কে?

আমি এক নির্বাসিত- নিজের প্রাণ ও সম্মানের বিনিময়ে দিমিত্রি নিকোলেফ যাকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন!

আপনার নাম?

ভ্লাদিমির ইয়ানোফ!

.

১২. ভ্লাদিমির ইয়ানোফ

রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলো বলে ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে পাঠানো হয়েছিলো সাইবেরিয়ায়–যাবজ্জীবন নির্বাসনে। ইলকা নিকোলেফ, তার বাগদত্তা, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আবার কোনোদিন তাকে চর্মচক্ষুতে দেখতে পারে। তারপর নির্বাসনে চার বছর কেটে যাবার পর, ভ্লাদিমির পালালো। পেরিয়ে এলো রুশদেশের বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি, পৌঁছুলো এসে পেরনাউ, ইচ্ছে এখান থেকে জাহাজ চেপে যাবে ফরাসি দেশে। এই পেরনাউতেই সে ছিলো লুকিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বলটিকের সাগরে জাহাজ চলাচল শুরু হলেই কোনো-একটা জাহাজে গিয়ে উঠবে সে গোপনে, এই ছিলো স্থির। কিন্তু থাকে কী করে সে পেরনাউতে! ছন্নছাড়া, ঘরছাড়া, হাতে টাকা নেই; আশ্রয় জোটে কোথায়? তাই সে চিঠি লিখেছিলো দিমিত্রি নিকোলেফকে সাহায্য চেয়ে। এই চিঠি পাবামাত্রই রওনা হয়ে পড়েন অধ্যাপক চাদিমিরের বাবা তার কাছে যে-টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, তাই তিনি ছেলের হাতে তুলে দেবেন। গোড়ায় নিকোলেফ কাউকেই তার কথা খুলে বলেননি। তার কারণ ভ্লাদিমির সত্যি পেরনাউ পৌঁছেছে কিনা সঠিক তিনি জানতেন না, পরে ভ্লাদিমির তাঁর কাছ থেকে কথা নিয়েছিলো যে কিছুতেই তিনি যেন আপাতত ইলকাকে তার কথা খুলে না বলেন–বিদেশে নিরাপদ জায়গায় থেকে চিঠি

লিখলে পরেই তাকে সব কথা বলা চলবে। কাজেই গোপনে রিগা থেকে পেরনাউ যেতে হয়েছিলো নিকোলেফকে। টিকিট কেটেছিলেন রেফেল পর্যন্ত যাতে কেউ বুঝতে না-পারে তার আসল গন্তব্যস্থল কোথায়।

তারপর এই কাণ্ড!

এখন আর কারু বুঝতে বাকি রইলো না কেন ও-রকম জেদ করে সব কথা দিমিত্রি নিকোলেফ চেপে যাচ্ছিলেন। এই নির্বাসিতকে বাঁচাবার জন্যই তিনি এমনকী নিজের প্রাণ সংশয় করে তুলেছিলেন।

দরজা খুলে গেলো; ভ্লাদিমির ইয়ানোফ আলিঙ্গন করলে দিমিত্রি নিকোলেফকে, সম্ভাষণ জানালে জাঁকে, বুকে চেপে ধরলে তার বাগদত্তাকে। কর্নেল রাগুয়েনোফ আর মেজর ফেরডের কলের পুতুলের মতো তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। এবার তাদের দিকে ফিরে ভ্লাদিমির বললে :

পেরনাউতে হঠাৎ আমি জানতে পেলুম যে দিমিত্রি নিকোলেফকে এক নৃশংস হত্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে, সন্দেহের প্রধান কারণ, তিনি নাকি কিছুতেই বলতে চাচ্ছেন না কোথায় যাবেন বলে তিনি সেদিন কোচবাক্সে চেপেছিলেন, যাত্রার উদ্দেশ্যই বা কী। কেবল আমার নামটি উচ্চারণ করলে সব সন্দেহ থেকে খালাশ পেয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু আমাকে তিনি জড়াতে চাননি, সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছি, একবার হদিশ পেলে আবার পুলিশ আমাকে পাকড়াবে। ব্যাপারটা শোনবামাত্র আমি একতিলও দেরি করিনি– সোজা এখানে এসে হাজির হয়েছি। মিখায়েল ইয়ানোফের বন্ধু আপনি, বন্ধুপুত্রকে

বাঁচাবার জন্য আপনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তুলেছিলেন দিমিত্রি নিকোলেফ। কিন্তু আমি তা হতে দেবো কেন...

ভুল করেছো তুমি, ভ্লাদিমির, ভুল করেছে। আমি নিরপরাধ, আমার কোনো ভয় ছিলো না–শীগগিরই আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যেতো। কিন্তু আবার তুমি...

কিন্তু আমি কি ঠিক করিনি, ইলকা? ভ্লাদিমির তার বাগদত্তাকে জিগেশ করলে।

নিকোলেফ মেয়েকে বললেন, ও-কথার কোনো উত্তর দিসনে, ইলকা। বাবা আর বাগদত্ত-এ-দুয়ের মধ্যেই তুই বাছবি কাকে? ...তোমার কর্তব্যবোধ দেখে আমি তোমাকে সম্মান করছি ভ্লাদিমির, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তুমি একটা আস্ত হাঁদা। কোনো নিরাপদ দেশে চলে যাওয়া উচিত ছিলো তোমার। সেখান থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারতে। আর সে-চিঠি পাবামাত্র আমি সব কথা খুলে বলতে পারতুম। তুমি বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে, এই ভরসাতেই আমি এই বিষম দিনগুলো সহ্য করতে পারতুম।

বাবা, ইলকার গলার স্বর খুবই দৃঢ় শোনালো, আমার কথা শোনো। ভ্লাদিমির ঠিক কাজই করেছে। জীবন দিয়েও ওকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবো না...

ধন্যবাদ তোমাকে, ইল্কা, ভ্লাদিমির বললে, অন্তত একদিনের জন্যও তোমার বাবাকে আমি যে এই বিষম দুর্বিপাক থেকে বাঁচাতে পেরেছি, তাতেই আমার শান্তি।

ভিড়ের মধ্যে এদিকে মুহূর্তে সব যেভাবে পালটে গেলো, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। জনমতের মতো চঞ্চল ও অবিরাম পরিবর্তমান আর-কিছু নেই। নিকোলেফের বাড়ি আক্রমণ করবার ইচ্ছে আর কারু রইলো না, পুলিশকে আর জনতার হাত থেকে দিমিত্রিকে বাঁচাবার জন্য তোড়জোড় করতে হবে না।

কিন্তু ভ্লাদিমির ইয়ানোফের অবস্থাটা নতুন অনেক সমস্যা চেতিয়ে তুললো। সন্দেহ নেই, ভ্লাদিমিরের কর্তব্যবোধ ও সহৃদয়তা অনুকরণযোগ্য, কিন্তু সে যে একজন রাজনৈতিক বন্দী তাও তো মানতে হয়। কাজেই কর্নেল রাগুয়েনোফ তাকে বললেন, ভ্লাদিমির ইয়ানোফ, আপনি সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছেন, রাজ্যপালকে এ-কথা আমায় জানাতে হবে। আপনি যদি কথা দেন যে পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে আপনাকে আপাতত এখানে আমি থাকতে দিতে পারি। আমি সে-ফাঁকে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে আসবো।

আপনি ভাববেন না, কর্নেল, আমি কথা দিচ্ছি, পালাবো না, ভ্লাদিমির বললে।

সারজেন্ট য়েক ও তার লোকজনকে রাস্তায় পাহারা বসিয়ে কর্নেল রাগুয়েনোফ চলে গেলেন।

আর পুলিশ চলে যেতেই পারিবারিক প্রীতিসম্মিলনীর মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। ভ্লাদিমিরের অবস্থা যে সংকটজনক, এ-কথা সবাই যেন ভুলেই গেলো। সবাই তখন ভবিষ্যতের সানন্দ ভাবনাতেই মুখর ও মশগুল। এই দেখে ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোও সাময়িকভাবে বিদায় নিলেন।

কর্নেল ফিরলেন ঠিক এক ঘণ্টা পরে। ভ্লাদিমিরকে তিনি বললেন, জেনারেল গোরকোর আদেশ, আপনাকে রিগা কেল্লায় যেতে হবে। সেন্ট পিটাসবুর্গ থেকে কী নির্দেশ আসে, জেনে, আপনার ব্যবস্থা করা হবে। নির্দেশ আসা পর্যন্ত আপনাকে ঐ কেল্লায় থাকতে হবে।

+

এতদিন সকলের আলোচনার ও উত্তেজনার বিষয় ছিলো পোখ-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কিন্তু ভ্লাদিমির ইয়ানোফের আবির্ভাবের পর থেকে সব পালটে গেলো। নিকোলেফ সম্বন্ধে লোকের ধারণা শেষ পর্যন্ত যা-ই থাক না কেন, ভ্লাদিমিরের সাহস ও কর্তব্যবোধের প্রশংসা না-করে উপায় নেই। নিকোলেফকে বাঁচাবার জন্য সে এমনকী নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতেও ইতস্তত করেনি! যাবজ্জীবন নির্বাসন হয়েছিলো তার, ছিলো গুরুতর রাজনৈতিক অভিযোগ; জানে যে এবার ধরা পড়লে তার আর রেহাই নেই; তবু সে বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেনি; তাকে বাঁচাবার জন্যই নিকোলেফ নিজের উপর সন্দেহ ঘনীভূত করে তুলেছিলেন- এখন পুরো অবস্থাটা একেবারে উলটে গিয়েছে। সম্রাটের আদেশ কী হবে কে জানে। জার কি আবার তাকে পাঠাবেন সাইবেরিয়ায়– যেখান থেকে অত কষ্ট করে বেচারি পালিয়েছিলো? তাছাড়া এটা ভাবলেও ভুল হবে যে তার আবির্ভাবের সঙ্গে–সঙ্গেই নিকোলেফের নির্দোষিতা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়ে গেলো। বিশেষ করে, রিগায়, যেখানে আলেমানদের সংখ্যা ও প্রভাব নেহাৎ কম নয়, সেখানে এটা ভাবাই ভুল। বড়োলোকদের বেশির ভাগেরই ধারণা এই অধ্যাপক, এই স্লাভ জাগরণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, মোটেই নির্দোষ নন। এখনো তো আততায়ীর কোনো সন্ধান মেলেনি। না-হয় ধরেই নেয়া গেলো নিকোলেফ যাচ্ছিলেন ভ্লাদিমিরের উদ্দেশে, কিন্তু

এটা তো সত্যি যে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় তেরো তারিখ রাত্তিরে তিনি ছিলেন। আর এটাও তো সত্যি যে পোখ ঐ রাত্তিরেই ঐ সরাইতে খুন হয়েছে সব টাকাও চুরি হয়েছে! তাছাড়া নিকোলেফ যে-ঘরে ছিলেন, সেই ঘরেই কি জানলা ভাঙার হাতুড়িটা পাওয়া যায়নি? অবশ্য বাইরের কেউ খুন করেছে কি না, তাও নিশ্চিত বলা যায় না। সরাইওলা ক্রোফও খুন করে থাকতে পারে। তারও সব সুযোগ ছিলো। অধ্যাপক চলে যাবার আগে কিংবা পরে, যখন ইচ্ছে সে খুন করে থাকতে পারে। পোখ-এর ব্রীফ-কেসে যে তাড়াতাড়া নোট রয়েছে, তা তো সেও জানতো।

কিন্তু সব তদন্তের পরেও সরাইওলা ক্রোফের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এমনও হতে পারে যে খুনের জন্য দায়ী আসলে উত্তর লিভোনিয়ার কুখ্যাত ও দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা, যাদের ধরবার জন্য পুলিশ অনবরত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

সারাদিন এ-কথাই আলোচনা করছিলেন কর্নেল রাগুয়েনোফ ও মেজর ফেরডের। দ্যাখো মেজর, তোমরা যে বলছে, নিকোলেফ তার ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকেছিলো, সেটা নিছকই অনুমান বলে বোধ হচ্ছে আমার।

কিন্তু ঐ দাগগুলো...।

দাগগুলো?... সেগুলো টাটকা দাগ কি না কে জানে! তা তো আর নির্ভুল করে প্রমাণ করা যায়নি। সরাইটা একেবারে বড়ো রাস্তায় উপরে। সে-রাতে বা অন্য কখনো কোনো চোর যে জানলা দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করেনি, তা-ই বা কে বলতে পারে।

একটা কথা মনে রাখবেন, কর্নেল। আততায়ী যে-ই হোক না কেন, সে জানতে পোখ-এর ঘরে মূল্যবান কিছু আছে। এবং নিকোলেফের এ-তথ্য অজ্ঞাত ছিলো না।

সে তো ক্রোফও জানতো। জানতো ব্রোক্স। রাস্তায়-ঘাটে সহিসরাই কি তা জানতো না? পোখ যে-রকম বাক্যিবাগীশ তাতে দেশশুদ্ধ লোক এ-কথা জানতো বলে মনে হয়। সরাইতে যে চাষী বা কাঠরেরা ছিলো, তারাও এমনকী চট করে টের পেয়ে গিয়েছিলো যে পোখ-এর ব্রীফ-কেসে প্রচুর টাকা আছে।

কাজেই আলোচনা করে কোনো সুরাহা হবার জো ছিলো না। প্রমাণ চাই–নির্জল, অকাট্য, শক্ত প্রমাণ। কিন্তু সব তর্কবিতর্ক সত্ত্বেও মেজর ফেরডেরের বদ্ধমূল ধারণা যে নিকোলেই খুনী-আর-কিছুই তিনি মানতে চান না।

তাহলে, কর্নেল রাগুয়েনোফ বললেন, শেষ পর্যন্ত এ-কথা বলতেই হয় যে আলেমানরা চিরকালই আলেমান।

সেই অর্থে স্লাভও চিরকালই স্লাভ থেকে যায়।

দেখা যাক, কেরস্টোফ তদন্ত করে কী বার করতে পারেন। তার গোয়েন্দাগিরির উপরেই এখন সব নির্ভর করছে।

+

কেরস্টোফ কিন্তু চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না। এই হত্যারহস্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সেইজন্যই তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে তদন্ত চালাচ্ছিলেন। সাক্ষীশাবুদ ডাকা, জেরা করা, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব জানবার চেষ্টা করা কিছুই বাদ যাচ্ছিলো না। সহিসদের তিনি জেরা করলেন, জেরা করলেন কাঠরে ও চাষীদের সেদিন যারা ঐ। সরাইতে উপস্থিত ছিলো। ব্রোক্সকে অনেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু ব্রোক্স সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। দুর্ঘটনার পর সে কোচবাক্সের সহিস ও গাড়োয়ানদের নিয়ে সোজা গিয়েছিলো পেরনাউ; মাঝখানে একটা সরকারি আস্তাবলে সে যে রাত কাটিয়েছিলো, এ-তথ্য অকাট্য, কেননা প্রচুর সাক্ষী ছিলো তার। কাজেই বাইরের কারু কাণ্ড বলে চালিয়ে দেবার জো ছিলো না এটাকে। রাস্তার চোরডাকাত কী করে জানবে যে পোখ-এর কাছে টাকা আছে, তাছাড়া হঠাৎ তাকে সরাইখানায় রাত কাটাতে হচ্ছে এবং রাত কাটাতে হচ্ছে ঐ ঘরটায়।

কাজই সব সন্দেহ গিয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনের উপরেই পড়ছে–সরাইওলা এ ড্রামা ইন লিভভানিয়া আর নিকোলেফ। সন্দেহ নেই যে এদের দুজনের একজনই খুনী। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই ক্রোফ ছিলো নজরবন্দী– সবসময় গুপ্তচরের চোখে-চোখে। বহুবার তাকে জেরা করলেন কেরস্টোফ–অনেকক্ষণ ধরে তাকে প্রশ্নের পর। প্রশ্ন করা হলো– যদি অতর্কিতে কিছু বেস বলে ফেলে তো চেপে ধরা হবে। কিন্তু তার আচরণে, কথায়-বার্তায় সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলো না।

+

চব্বিশে এপ্রিল জাঁ চলে গেলো ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপাতত অন্তত খুনীর ছেলে বলে কেউ তাকে নিগ্রহই করবে না। সে গিয়ে পৌঁছুতেই তার বন্ধুরা তাকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে স্বাগত জানালে সবচেয়ে উল্লাস প্রকাশ করলে অবিশ্যি গোসপোদিন। কিন্তু বিপক্ষদল তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। তারা কেবল গোল বাধাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো–বোঝা গেলো যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না হয়ে বুঝি যায় না।

কাণ্ডটা ঘটলো পরের দিনেই। জাঁ যখন কার্ল-এর কাছে গিয়ে দাবি করলে যে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে, তখন ছোকরা ইয়োহাউজেন আরো উদ্ধতভাবে তাকে অপমান করে কথা বললে। সঙ্গে-সঙ্গে জা তার গালে চড় কষিয়ে দিলে। ফল হলো দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এবং তাতে কার্ল ইয়োহাউজেন বিষমভাবে আহত হলো।

এ-খবর যখন রিগা পৌঁছলো, তখন যেন আগুনে ঘি পড়লো। হের ও ফ্রাউ ইয়োহাউজেন তক্ষুনি ছেলের শুষার জন্য ডোরপাট রওনা হয়ে গেলেন। বোঝা গেলো, অচিরেই স্লাভে-জার্মানে ভীষণ দাঙ্গা আসন্ন।

দাঙ্গা বাধার আগেই অবিশ্যি সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে বার্তা এলো। স্লাদিমির ইয়োনোফকে জার ক্ষমা করেছেন–তার নির্বাসনকে মকুব করা হয়েছে, আর তাকে সাইবেরিয়ায় ফিরে যেতে হবে না। তাকে ছেড়ে দেবার জন্য আদেশ হলো। সবাই মোটামুটি আগেই আন্দাজ করেছিলো যে জারের নির্দেশ এ-রকমই হবে। কেননা ভ্লাদিমির ইয়ানোফের ঘটনাটার কথা সারা দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, তাকে আবার সাজা দিলে তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়তো আর শামলানো যেতো না।

আবার জেরা

১৩. আবার জেরা

ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে যে ক্ষমা করা হলো তার প্রতিক্রিয়া হলো বিপুল শুধু রিগায় নয়, সমগ্র বলটিক রাজ্যগুলিতেই, সরকার যে এখন জার্মান-বিরোধী প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে চাচ্ছেন, এই নির্দেশে তারও ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। শ্রমিকশ্রেণী, সাধারণ মানুষ এতে খুবই খুশি, শুধু ক্ষুব্ধ হলো জমিদারেরা, বণিকসম্প্রদায় ও মধ্যবিত্তরা। তাদের মনে হলো এই নির্দেশের মধ্য দিয়ে শুধু ভ্লাদিমিরকেই নয়, দিমিত্রি নিকোলেফকেও দয়া দেখানো হয়েছে। কিন্তু, এটা ঠিকই যে ভ্লাদিমির যেভাবে দিমিত্রিকে বাঁচাবার জন্য জীবন বিপন্ন করে নিজে থেকেই এসে ধরা দিয়েছিলো, তাতে তাকে ক্ষমা না-করে কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে অধ্যাপক নিকোলেফকে সন্দেহ করার জন্যও কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ উহ্য আছে–এতদিন তিনি ছিলেন দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও সম্মানযোগ্য নাগরিক, আগামী নির্বাচনে তিনি স্লাভদলের হয়ে দাঁড়াবেন বলে স্থির; এই অবস্থায় কোনো প্রমাণ ছাড়াই শুধু সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তাকে লাঞ্ছিত করা সেন্ট পিটার্সবুর্গ খুব-একটা সুনজরে দ্যাখেনি।

অন্তত জারের বদান্যতার এই অর্থই করলেন রাজ্যপাল জেনারেল গোরকো এবং তার মতামত তিনি অধস্তন কর্মচারীদের কাছে চেপে রাখলেন না। ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে মুক্ত করে দেয়া হলো; সে ফিরে গেলো নিকোলেফ-ভবনে। একটু পরেই এলেন পারিবারিক বন্ধুরা : ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয় দ্যলাপোর্ৎ। ভ্লাদিমিরের মুক্তিতে সবাই খুব খুশি।

বিকেলে চায়ের বৈঠক বসেই ঠিক হলো ইলকা ও ভ্লাদিমিরের বিয়েটা এবারে হয়ে যাওয়া উচিত। বিয়ের দিন ঠিক হলো ছ-সপ্তাহ পরে। মধ্যবর্তী সময়টা ভ্লাদিমির নিকোলেফ- ভবনেই থাকবে নিচের তলায় একটা ঘরে।

+

নিকোলেফ-ভবনে যখন স্বপ্নেরও অতীত আনন্দের হাট বসেছে, ইয়োহাউজেন পরিবারে তখন কিন্তু অবস্থাটা ঠিক তার উল্টো। তার কারণ এই নয় যে, কার্ল-এর দশা শোচনীয় হয়ে উঠেছে– বরং চিকিৎসক জানিয়েছেন যে সময় ও শুশ্রূষা পেলে কার্ল সেরে উঠবে– জখম যদিও গুরুতর, তবু প্রাণের ভয় নেই। আসলে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের দুঃখের কারণ অন্যত্র। ভেবেছিলেন, অধ্যাপক নিকোলেফকে বুঝি তিনি শাবাড় করে এনেছেন, কিন্তু এখন দেখতে পেলেন ঘটনার গতি অন্য খাতে বইছে। এখন কেবল তার হাতে আছে শেষ অস্ত্র-দেনার দায়ে শত্রুকে কোণঠাসা করা ছাড়া এখন আর নিকোলেফের ক্ষতি করার কোনো উপায় তার হাতে নেই। এই ঋণপত্রই তাঁর তুরুপের তাস। কিন্তু এই রঙের টেক্কাটিকে সহজে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন না তিনি, কেননা তার ফলে তার সম্বন্ধে লোকের মনোভাব বিরূপ হয়ে উঠবে বিশেষত এখন যখন লোকের সহানুভূতি নিকোলেফের প্রতি। খুনের ব্যাপারটায় জনমত এখন স্পষ্টতই ক্রোফ-এর বিপক্ষে, সকলেরই এখন ধারণা যে সরাইওলাই সে রাত্রে পোখকে সুযোগ পেয়ে খুন করেছিলো। ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের মনস্তাপের কারণ এখন এই জনমত।

+

সত্যি, জনমতের চাপটা এমনি প্রবল হয়ে উঠলো যে কর্তৃপক্ষকে আবার নতুন করে তদন্তের ব্যবস্থা করতে হলো : আবার যেতে হলো সেই ভাঙা কুশের সরাইখানায়। ৫ই মে কেরস্টোফ নিজে গেলেন সেখানে তদন্তে, সঙ্গে গেলেন মেজর ফেরডের ও সার্জেন্ট য়েক।

ক্রোফ, দেখা গেলো, তাদেরই প্রত্যাশা করছিলো। হঠাৎ এই সমাগম দেখে সে কিন্তু মোটেই অবাক হয়নি। সে শুধু বললে, বুঝতে পারছি, কেউ-একজন আমার ঘাড়েই দোষ চাপাবার চেষ্টা করছে; তবে আশা করছি, আপনারা যাবার আগেই বুঝতে পারবেন যে আমি নির্দোষ।

দেখা যাক, উত্তরে ছোট্ট করে বললেন কেরস্টোফ।

আবার সব তন্নতন্ন করে দেখা হলো; দেখা হলো বাগান, বাগানের। চালাঘর, প্রত্যেক গাছের তলা, ঝোঁপের ধার, শজিখেত। ক্রোফ যদি চুরি করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই চোরাই টাকা সে কোথাও মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছে– সুতরাং এ-বিষয়টায় নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত।

কিন্তু সব খোঁজাখুঁজিই নিষ্ফল হলো, আর টাকা? ক্রোফের সিন্দুকে দেখা হলো সবশুদ্ধ শ খানেক রুব্ল আছে তাদের কোনোটিই নম্বরি নোট নয়।

সব দেখে মেজর ফেরডের একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন কেরস্টোফকে : মঁসিয় কেরস্টোফ, এটা ভুলবেন না যে, খুনের পর থেকে ক্রোফ কখনো একা কোথাও যায়নি

ওর পেছনে সবসময় পুলিশের লোক ছিলো। মেজর ফেরডেরের এখনও বদ্ধমূল ধারণা, নিকোলেই খুনী- কাজেই ক্রোফের এখানে তত্ত্বতালাশ করা সবই পণ্ডশ্রম।

কেরস্টোফ বললেন, তা আমি জানি। কিন্তু নিকোলেফ সে-রাত্রে সরাই থেকে চলে যাবার পর পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত ক্রোফ কয়েক ঘণ্টা সময় পেয়েছিলো। চোরাই টাকা লুকোবার পক্ষে সেই সময়টুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু এখন তো দেখতেই পেলেন ওকে জড়াবার মতো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

এখন পর্যন্ত কিছু পাইনি–তা সত্যি। কিন্তু এখনও তো আমাদের অনুসন্ধান শেষ হয়নি। ঘর দুটোর চাবি তো আপনার কাছে আছে, তাই না?

মেজর ফেরডের চাবি দুটো বার করলেন : সেই দুটি ঘরের চাবি, যার একটায় ছিলো পোখ, অন্যটায় দিমিত্রি নিকোলেফ, পোখ যে-ঘরটায় খুন হয়েছিলো সে-ঘরটাই প্রথমে খোলা হলো।– প্রথমবার সরেজমিন তদন্ত করে যাবার সময় পুলিশ ঘরটাকে যেমন রেখে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনি আছে ঘরটি। বাইরে থেকে কেউ যে খড়খড়ি খুলে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেনি, পরীক্ষা করে দেখে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলো। তেমনি পড়ে আছে বিছানা– এলোমেলা; বালিশে রক্তের দাগ, দরজা অব্দি মেঝে লাল রঙে ছোপনো! নতুন কোনো সূত্রই পাওয়া গেলো না : খুনী- সে যেই হোক না কেন– পিছনে কোনো সূত্রই রেখে যায়নি।

চলুন তবে অন্য ঘরটায়, কেরস্টোফ বললেন।

প্রথমেই দরজাটা তন্নতন্ন করে দেখা হলো : কবাটের বাইরের দিকে সন্দেহজনক কোনো দাগ নেই। তাছাড়া গত দশদিনে কেউ যে ও-ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করেনি, পাহারা-পুলিশ তা হলফ করে বললে তারা কখনো ও-জায়গা ছেড়ে নড়েনি গত দশদিনে। ঘরটার মধ্যে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার।

সার্জেন্ট য়েক গিয়ে জানলা খুলে দিলে, যাতে ঘরে আলো আসে। না, গতবার যেমন রেখে যাওয়া হয়েছিলো তেমনি আছে ঘরটা কোনো বদলের কোনো চিহ্ন নেই। নিকোলেফ যে-বিছানায় শুয়েছিলেন, তার শিয়রের কাছে একটা টেবিলে বাতিদানে একটা আধপোোড়া মোম পড়ে আছে। এক কোনায় একটা চেয়ার, অন্য ধারে একটা টুল। ডানপাশে একটা বন্ধ দেরাজ। চুল্লির উপরে, কিংবা বলা যায় দুটো চ্যাপ্টা পাথরে বসানো কাজ চালানো গোছের চুল্লির উপরে চিমনি বসানো– তার তলার দিকটা সুপরিসর, ছাতের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। বিছানাটা দেখা হলো তন্নতন্ন করে–না, সন্দেহজনক কিছু নেই। দেরাজ খুলে দেখা হলো- সেটা ফাঁকা পড়ে আছে- কাপড়চোপড় বা কাগজপত্র কিছুই নেই।

চুল্লির পাশেই পড়েছিলো কয়লা খোঁচাবার লম্বাটে হাতুড়িটা–খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলে সেটাকে। এর মুখটা বাঁকা, দোমড়ানো গোছের, কাজেই খড়খড়ি তুলে হাতুড়িটা ভিতরে ঢুকিয়ে চাপ দিলে জানলা খুলতে দুঃসাধ্য হবার কথা নয়। কিন্তু খিলগুলো এত পুরোোনো ও জীর্ণ যে ছোট্ট একটা কঞ্চি ঢুকিয়ে চাপ দিলেই নিশ্চয় ভেঙে যাবে। আর জানলার গোবরাটে যে-দাগগুলো, তা যে জানলা বেয়ে ভিতরে ঢোকবার সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, তা কি হলফ করে বলা যায়? অন্যকোনো কারণেও গোবরাটে ও-দাগ হতে পারে।

চুল্লির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কেরস্টোফ। সে-রাত্তিরে যাত্রীটি কি আগুন জ্বালিয়েছিলো? জিগেশ করলেন তিনি ক্রোফকে।

না, সরাইওলা উত্তর দিলে।

কিন্তু এই-যে ছাই পড়ে আছে? এগুলো কি প্রথমবার তদন্তের সময় পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিলো?

মেজর ফেরডের বললেন, মনে তো হয় না।

তাহলে এখন পরীক্ষা করে দেখুন।

সার্জেন্ট নিভস্ত চুল্লিটার উপর ঝুঁকে পড়লো। বাঁদিকে দেখতে পেলে একটা কাগজের টুকরো পোড়া কাগজের টুকরো, ছাই-ভস্মের মধ্যে পড়ে আছে।

পোড়া কাগজটা তুলে দেখবামাত্র সবাই চমকে গেলেন : একটা ব্যাঙ্কনোটের টুকরো। হ্যাঁ, একশো রুবলের একটা নোট- নম্বরের জায়গাটা পুড়ে গিয়েছে, বোধহয় টেবিলের ঐ জ্বলন্ত মোমবাতির শিখায় কোনোভাবে পুড়ে গিয়েছে। আরো সাংঘাতিক : রক্তের ছিটে লেগে আছে নোটটায়। খুনীর হাতে রক্ত ছিলো নিশ্চয়ই, রক্তমাখা হাতে ধরেছিলো বলেই রক্তের দাগ লেগেছিলো নোটটায় আর রক্ত লেগেছে বলেই নিশ্চয়ই নোটটাকে সে পোড়াতে চাচ্ছিলো।

আর পোখ-এর ব্রীফ-কেস ছাড়া আর কোত্থেকেই বা আসতে পারে নোটটা। কিন্তু পুরো নোটটা পোড়েনি বলে এখন তার দাম একশো রুবলেরও অনেক বেশি–কেননা খুনীর বিরুদ্ধে এটা প্রজ্বলন্ত প্রমাণ।

ক্রোফ আর নিজেকে শামলাতে পারলে না, বলে উঠলো, কী বলেছিলুম? এবার আমার নির্দোষিতায় আর সন্দেহ নেই তো আপনাদের?

কেরস্টোফ প্রথমে তার নোটবইয়ের কাগজের ভাঁজে সন্তর্পণে আধপোড়া নোটকে রাখলেন, তারপর শান্ত ধীর স্বরে বললেন, তদন্ত শেষ হয়েছে–চলুন, এবার যাই।

+

পরদিন সকালবেলাতেই ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এই নতুন তথ্যটি জানতে পেলেন। ব্যাঙ্কনোটের নম্বরের জায়গাটুকু পুড়ে গিয়েছিলো, তাই মিলিয়ে অবিশ্যি দেখা গেলো না, তবে সন্দেহ নেই যে নোটটা পোখ-এর ব্রীফ-কেসেই ছিলো নইলে ওখানে ঐ চুল্লিতে আর কী করে আসবে।

খবর যেন পাখির মতো উড়াল দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই রিগার সব লোক এই সংবাদ শুনতে পেলে। নিকোলেফের শুভানুধ্যায়ীরা খবরটা শোনবামাত্র অভিভূত হয়ে গেলেন।বোঝাই যাচ্ছে যে তদন্তের এটা দ্বিতীয় ও বিষম পর্যায়। ইয়োহাউজেনরা অবিশ্যি খুবই আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন। এবার আর নিকোলেফের গ্রেফতার ঠেকায় কে? একবার জুরিদের সামনে দাঁড় করালেই এই নৃশংস হত্যার সমুচিত শাস্তি তিনি পাবেন।

চাদিমিরকে খবরটা জানিয়েছিলেন ডাক্তার হামিনে। দুজনেই স্থির করেছিলেন যে নিকোলেফকে এ-সম্বন্ধে তারা নিজে থেকে কিছু খুলে বলবেন না– শিগগিরই অন্য ও ভয়ংকর সূত্র থেকে খবরটা তিনি জেনে যাবেন। ভ্লাদিমির চেয়েছিলো ইলকার কাছ থেকে গুজবটা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু তা কি আর সম্ভব? ভ্লাদিমির বাড়িতে এসে দেখলে ইলকা বসে আছে, গভীর শোকে আচ্ছন্ন। তাকে দেখেই বেচারি তীব্র অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, বাবা কোনো দোষ করেননি, ভ্লাদিমির, বাবা নিরপরাধ!

কী আশ্চর্য! এটা কি আবার বলবার কথা নাকি? দিমিত্রি যে নিরপরাধ এটা আমরা সব্বাই জানি। আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের তাহলেই এ-সব গুজব আর রটবে না। আমার কিন্তু খুবই মনে হয় যে দিমিত্রিকে এই খুনের মামলায় জড়াবার পেছনে একটা-কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে।

খুব-যে একটা ভুল সন্দেহ করেছিলো ভ্লাদিমির, তা নয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যে কী-রকম গভীর ও দূরস্পর্শী হতে পারে, তা সাইবেরিয়ায় কিছুকাল কাটিয়ে আসার পর তার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীরা যে-রকম আটঘাট বেঁধে নেমেছে তাতে দিমিত্রি না আইনের চোখে দোষী বলে প্রমাণিত হয়ে যান। ইলকাকে সান্ত্বনা দিলেও ভ্লাদিমির নিজে কিন্তু একফোঁটাও স্বস্তি পাচ্ছিলো না পুলিশের হাতের এই নতুন সূত্রটিকে তার মনে হচ্ছিলো এই সাজানো মামলার বিরুদ্ধ পক্ষের তুরুপের তাস।

+

বিকেলবেলাতেই এত্তেলা এলো ম্যাজিস্ট্রেটের : নিকোলেফ যেন অবিলম্বে কেরস্টোফের আপিশে গিয়ে হাজির হন। প্লাদিমির সঙ্গে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু দিমিত্রি তক্ষুনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

কেরস্টোফ নিজে কিঞ্চিৎ বিচলিত ছিলেন- এটা তিনি কিছুতেই ভাবতে পারছিলেন না যে দিমিত্রির দ্বারা এই খুন সম্ভব। অথচ যেভাবে প্রমাণ জড়ো হচ্ছে, তাতে দিমিত্রিকে তিনি গ্রেপ্তার করবেন কিনা শিগগিরই সে-সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

নিকোলেফকে দেখে প্রথমে তাকে বসতে বললেন তিনি, তারপর বললেন, মঁসিয় নিকোলেফ, কাল আমরা সরাইখানাটায় সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলুম–আমি নিজে উপস্থিত ছিলুম তদন্তের সময়। পুলিশ পুরো বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। নতুন-কোনো সূত্রই পাওয়া যায়নি, তবে আপনি যে-ঘরটায় রাত কাটিয়েছিলেন, সেই ঘরে এই জিনিশটা পাওয়া গেছে। বলে তিনি আধপোড়া ব্যাঙ্কনোটটা বাড়িয়ে দিলেন অধ্যাপকের দিকে।

কী কাগজ এটা?

একটা ব্যাঙ্কনোটের টুকরো–নোটটা পুড়িয়ে চুল্লিতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো।

পোখ-এর ব্রীফ-কেসের ব্যাঙ্কনটের একটা?

সম্ভবত। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মঁসিয় নিকোলেফ, এটা আপনার বিরুদ্ধে একটা অকাট্য প্রমাণ হিশেবে...

আমার বিরুদ্ধে? অধ্যাপকের গলার স্বর বিদ্রুপে ভরে উঠলো। তাহলে আমার উপর থেকে আপনাদের সন্দেহ যায়নি এখনো? স্নাদিমির ইয়ানোফের বিবৃতি সত্ত্বেও আপনাদের এখনো ধারণা যে আমিই খুন করেছি!

উত্তর দেবার আগে কেরস্টোফ একটু ইতস্তত করলেন। এই অধ্যাপকের উপর পর-পর অনেক ঝড় গেছে, তার জের শামলাতে না-শামলাতেই আবার এই নতুন ও ভয়ংকর প্রমাণ।

নিকোলেফ বললেন, আমি যে ঘরটায় রাত কাটিয়েছিলুম সে ঘরের চুল্লিতে নোটটা পাওয়া গেছে, তাই না?

হ্যাঁ, মঁসিয় নিকোলে।

ধর্মাধিকরণ প্রথম সেখানে পদার্পণ করার পর থেকে ঘরটা বন্ধ ছিলো।

হ্যাঁ, তালা লাগানো ছিলো। দরজাটা যে এর মধ্যে ভোলা হয়নি সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ফলে কারু পক্ষেই এর মধ্যে সে-ঘরে ঢোকা সম্ভব ছিলো না?

না, কারু পক্ষেই ছিলো না।

ভূমিকাগুলো যেন পালটে গেছে–নিকোলেফ জেরা করছেন, কেরস্টোফ উত্তর দিচ্ছেন। কিন্তু কেরস্টোফ ভেবে দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদের কাজটা যেভাবে এগুচ্ছে, তা আসলে তাকে অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে। তাই তিনি কোনো রকম দ্বিধা না-করেই নিকোলেফের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

নোটটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিকোলেফ বললেন, রক্তমাখা নোট, অথচ পুরোটা পোড়েনি। কী বললেন, চুল্লির ছাইয়ের মধ্যে পড়ে ছিলো?

হ্যাঁ।

তাহলে প্রথমবার তদন্তের সময় এটা সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো কেমন করে?

সত্যি কথা বলবো? আমি তা জানি না। ব্যাপারটা আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই চুল্লিতেই পড়েছিলো নোটটা– কারণ পরে তো কারু দিয়েছে।ঘরে ঢোকা সম্ভব কালেফ বললেন এবড়ে যাওয়া উগুিয় চুল্লিতে

একটু ব্যঙ্গের স্বরে নিকোলেফ বললেন, আমিও আপনার চেয়ে কম স্তম্ভিত হচ্ছি না। তবে আমার বোধ হয় খুব ঘাবড়ে যাওয়া উচিত। কারণ আপনাদের অনুমান নিশ্চয়ই এ-রকম যে, আমিই নোটটাকে পুড়িয়ে চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেলেছিলুম।

তা ঠিক।

তাহলে, নিকোলেফ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, তো এই দাঁড়ায় যে, নোটটা যেহেতু পোখ-এর বাণ্ডিলের একটা, পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকেই যেহেতু তার হত্যার পর এটা চুরি করা হয়েছে, অতএব সে-রাতে ও-ঘরে যে-লোকটা রাত কাটিয়েছিলো সে-লোকটাই চোর আর খুনী

কেরস্টোফ আগাগোড়া লক্ষ করছিলেন নিকোলেফকে। এ-সম্বন্ধে কারু সংশয় থাকতে পারে কি?

না, তা থাকবে কী করে? কী রকম অকাট্য পারম্পর্য, লক্ষ্য করেছেন? একটা শেকলের অংশ–সিদ্ধান্তও চমৎকার। কিন্তু আপনাদেরই যুক্তির ধরনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরেকটা সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছোনো যায়।

বলুন।

রাত চারটে নাগাদ সে-রাতে আমি সরাইখানাটা ত্যাগ করি। প্রশ্ন হলো, খুনটা কি হয়ে গিয়েছিলো ততক্ষণে? আমি যদি খুনী হই, তাহলে হয়েছিলো নিশ্চয়ই আর আমি খুনী না-হলে হয়নি। যাকগে, এটা আসলে আমাদের আলোচ্য না। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমি চলে যাবার পর আততায়ী খুব ভেবেচিন্তে সব সন্দেহ পোখ-এর সহযাত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য সব-কিছু সাজাতে পারতো। সে কি যেতে পারতো না আমার ঘরে, হাতুড়িটা সঙ্গে নিয়ে? সে কি নোটটা ইচ্ছে করে আদ্ধেক পুড়িয়ে নেভানো চুল্লিতে রেখে দিতে পারতো না? সে কি জানলার গোবরাটে আঁচড় কাটতে পারতো না?

আপনি যা বলছেন, মঁসিয় নিকোলেফ, তা থেকে মনে হয় আপনি সরাইওলা ক্রোফকে অভিযুক্ত করছেন।

ক্রোফ, কিংবা অন্য-কেউ। তাছাড়া, খুনী কে, সেটা ধরে দেবার দায় আমার নয়। আমার কাজ হলো নিজেকে বাঁচানো– সব যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা।

কেরস্টোফ, সত্যি, একটু বিমূঢ় বোধ করছিলেন। নিকোলেফের কথায় সত্যিই যুক্তি যথেষ্ট। তাছাড়া, তাঁর মতো মানী লোক, সৎ লোক, গোটা রিগা যাঁকে এতকাল সতোর জন্য সম্মান করেছে, তাকে তিনি কিছুতেই খুনী বলে ভাবতে পারছিলেন না। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে তদন্তে ক্রোফ-এর বিরুদ্ধে কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি কিছু না।

আরো এক ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা হলো দুজনে। কেরস্টোফ নিকোলেফকে এটাও বললেন যে ক্রোফকে সন্দেহ করবার মতো কোনো সূত্র বা প্রমাণ পুলিশের হাতে নেই। কিন্তু ঘটনার পরম্পরা তার প্রতিও বিরূপ।

তখন নিকোলেফ সোজাসুজি বললেন, সূত্রগুলো কার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করছে, সেটা নির্ধারণ করার যাচাই করার দায় আপনাদের। কেউ যদি ভোলা মন নিয়ে ব্যাপারটার দিকে তাকায়, তাহলে আমাকে খুনী বলে সন্দেহ করবে না। আপনি তো এখন জানেন আগে কেন আমি যাত্রার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য গোপন রাখতে চাচ্ছিলুম। এখন যখন ভ্লাদিমির ইয়ানোফ নিজেই প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়েছে, তখন আমার সম্বন্ধে আগে যাও-বা সন্দেহ ছিলো তা নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছে। কে খুন করেছে সরাইওলা, না বাইরের কেউ, সেটা বার করার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু আমার এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে

ক্রোফই খুনী। পোখ যে রেফেল যাচ্ছে ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে, এটা সে জানতো এও যে টাকার অঙ্ক নেহাৎ কম নয়। আমি যে রাত চারটেতে সরাই ছেড়ে চলে যাবো তাও সে জানতো। কত সুবিধে তার–খুনটা করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেই চলবে। কখন খুন করেছিলো, আমি সরাই ছেড়ে চলে যাবার আগে না পরে, তা জানি না। কিন্তু আমি চলে যাবার পর আমি যে-ঘরে রাত কাটিয়েছিলুম, সে-ঘরে ঢুকে আমার বিরুদ্ধে সূত্র ছড়াতে প্রমাণ সাজাতে কতক্ষণই বা তার লেগেছিলো। সব সত্ত্বেও তবু যদি আপনাদের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে আমিই খুনী, বেশ, তবে জুরির সামনে দাঁড় করান আমাকে– সর্বসমক্ষে ক্রোফকে অভিযুক্ত করবো আমি– সবাই বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, কে খুনী–আমি না ক্রোফ।

নিকোলেফ মোটেই উত্তেজিত হননি। ঠাণ্ডাভাবে, বৈজ্ঞানিক তথ্য বলবার ভঙ্গিতে, সব কথা বলছিলেন। মামলাটার নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন, এ নিয়ে আর উত্তেজিত হবার কিছু নেই, ভঙ্গিটা ছিলো এ-রকম। কেরস্টোফ সব শুনলেন চুপচাপ, কিছু বললেন না। শেষটায় নিকোলেফ জিগেশ করলেন, আপনি কি আমার গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সই করবেন?

উত্তরে কেরস্টোফ শুধু বললেন, না, দিমিত্রি নিকোলে।

.

১৪. আঘাতের পর আঘাত

খুনী কে-ক্রোফ, না অধ্যাপক দিমিত্রি নিকোলেফ–এই প্রশ্নটিকে ঘিরেই লোকের মুখে-মুখে কথা ফিরতে লাগলো। প্রথম থেকেই এই খুনের খবরটা বিপুলভাবে প্রচারিত হচ্ছিলো, নানা রকম রাজনৈতিক স্বার্থ জড়ানো ছিলো বলে বোধহয় এত তার প্রচার–কিন্তু জটিলঝুরি রহস্য, জটের পর জট পাকিয়ে গেছে, এমন একটা খুনও সচরাচর হয় না–তাই গোটা বলটিক প্রদেশে এই নিয়ে হৈ-চৈ উঠলো, তুলকালাম কাণ্ড একেবারে। ক্রোফের দেহে জর্মান রক্ত, নিকোলেফ স্লাভ-কাজেই দুটো বিরুদ্ধ দল তৈরি হয়ে গেলো চটপট, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সর্বনেশে পূর্বাভাস যেন। এদিকে রাজ্যপালের দশাও ক্রমে করুণ হয়ে উঠছে। পৌরনির্বাচন আসন্ন–স্লাভরা এখন অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের বিরুদ্ধে দিমিত্রি নিকোলেফকে নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। আর ধনকুবের ইয়োহাউজেনরাও সবান্ধবে দিমিত্রির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মুখর। টাকা আছে তাদের, আছে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা, খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত তাদেরই হাতধরা। কাজেই শেষ পর্যন্ত রব উঠলো : অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে দিমিত্রিকে– ও-রকম একটি নৃশংস খুনীকে এভাবে ছেড়ে রাখা চলবে না।

আর এই ডামাডোলের মধ্যেই কেটে গেলো সাত দিন।

এদিকে ইয়োহাউজেনদের কাছে দিমিত্রির দেনার টাকা ফেরৎ দেবার শেষদিন এগিয়ে এলো–পরের দিন চোদ্দই; সেদিন যদি আঠারো হাজার রুবল না-নিয়ে তিনি ইয়োহাউজেন ব্রাদার্স-এর আপিসে হাজির হতে না পারেন, তাহলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে আদালতে। অথচ আজও তিনি টাকাটা জোগাড় করতে পারেননি। প্রায় সাত হাজার রুবল তিনি জমা দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে, ভেবেছিলেন বাকি টাকাটা জমা দেবার

মেয়াদ একটু বাড়িয়ে দেওয়া হবে কিন্তু এখন সব যেতে বসেছে তাঁর, মান-সম্ভ্রম, সব– এখন দেউলে বলে ঘোষিত না-হয়ে তার কোনো উপায় নেই।

আর ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন এটাই চাচ্ছিলেন। হয় দিমিত্রি পুরো টাকাটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দেবেন, নয় দেউলে হয়ে পৌর অধিকার সব হারিয়ে বসবেন–এর মাঝামাঝি কোনো মিটমাটের মধ্যে তিনি যাবেন না। গোড়ায় ভেবেছিলেন খুনের মামলাটায় বুঝি কোণঠাশা করে এনেছেন দিমিত্রিকে, কিন্তু এখন যখন দেখলেন যে খুনের রহস্যের কোনো কিনারাই হলো না, তখন আস্তিন থেকে বার করলেন তাঁর তুরুপের তাস–এই বিপুল ঋণ। কোনো টাকাই তো নেই দিমিত্রির–এ-তথ্য গোপনে সন্ধান নিয়ে নির্ভুল জেনে নিয়েছেন। যদি এখন তিনি টাকাটা জমা দিতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে যে চোরাই টাকা–এবং তাহলে উলটো দিক থেকে তার গলায় ফাঁস এঁটে বসে। না, এই স্লাভদের কোনো দয়া করা চলবে না। শোধ নিতেই হবে কার্ল-এর রক্তপাতের, তাছাড়া দিমিত্রিকে নির্বাচনেও দাঁড়াতে দেয়া হবে না।

পরের দিন সকালবেলাটা কেটে গেলো–ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সদের খাজাঞ্চিখানায় দিমিত্রির আবির্ভাব ঘটলো না। বিকেলবেলা, চারটে নাগাদ, পরোয়ানা বার করা হলো খাজাঞ্চিখানা থেকে–সেদিন আঠারো হাজার রুবল জমা দিতে না পারার জন্য পরোয়ানা।

পরোয়ানাটা গিয়ে পড়লো ভ্লাদিমির ইয়ানোফের হাতে। সে তখন ছিলো নিকোলেফ ভবনে। আর তার ফলেই ভ্লাদিমির জানতে পেলো যে কীভাবে নিকোলেফ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তার বাবার এই বিপুল ঋণ। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে তার একটুও দেরি হলো না। তার বাবার মৃত্যুতে কী লোকশান হয়েছে দিমিত্রির, কীভাবে মুচলেকা লিখে

তিনি বন্ধুর ঋণ শোধ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, সব সে জানতে পেলো। আর অমনি সে এটা বুঝলে যে এক্ষেত্রে তার কর্তব্য কী। মিখায়েল ইয়ানোফ কুড়ি হাজার রুবল গচ্ছিত রেখেছিলেন দিমিত্রির কাছেঁড়াদিমিরকে দেবার জন্য। সে-টাকাই তো তাকে পেরনাউতে পৌঁছে দিয়েছেন দিমিত্রি। সে-টাকা থেকে আঠরো হাজার রুবল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সদের খাজাঞ্চিখানার উদ্দেশে।

তখন পাঁচটা বাজে; খাজাঞ্চিখানা বন্ধ হবে ছটার সময়;হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লো চাদিমির। আর সময় নেই–খাজাঞ্চিখানা বন্ধ হবার আগে তাকে ওখানে গিয়ে পৌঁছুতেই হবে।

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছে গেলো; খাজাঞ্চির কাছে যেতেই তিনি তাঁকে ব্যাঙ্কের পরিচালকদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। ইয়োহাউজেন ভাইরা নিজেরাই এ মামলাটার তত্ত্বাবধান করছেন। দুজনেই ঘরে ছিলেন তখন। ভ্লাদিমিরের পাঠানো কার্ড দেখে একজন বলে উঠলেন : ভ্লাদিমির ইয়ানোফ! নিকোলেফের তরফ থেকে এসেছে দেখা করতে। নিশ্চয় আরো সময় চাইবে।

আর এক ঘণ্টা সময় দেয়া হবে না, নিষ্ঠুর গলায় ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন বললেন, কালকেই আমরা আইনের সাহায্য নেবো।

ইয়ানোফকে ঘরে ডেকে পাঠানো হলো।

ভ্লাদিমির ঘরে ঢুকেই খুব ঠাণ্ডা গলায় বললে, দিমিত্রি নিকোলেফ আপনাদের কাছে কিছু টাকা ধারেন–আজকেই সে-টাকা শোধ দেবার কথা, আপনারা সেজন্য সমনও পাঠিয়েছেন।

তা পাঠিয়েছি।

সুদ সমেত টাকার অঙ্ক হচ্ছে আঠারো হাজার রুবল?

হ্যাঁ–কিন্তু আমরা আর সময় দিতে পারবো না

সময় আপনাদের কাছে কে চেয়েছে? তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে ভ্লাদিমির।

ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন বললেন, টাকাটা দুপুর বারোটার মধ্যে দেবার কথা ছিলো...

তা তো না। আজকের মধ্যে দেবার কথা ছিলো। আর এখনো তো ছটা বাজেনি। আজকের তারিখ তো শেষ হয়ে যায়নি এখনো–অন্তত আমার তো তাই ধারণা।

বিদ্রুপের ভঙ্গিটা ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনকে রুষ্ট করে তুললো।

আঠারো হাজার রুবল নিয়ে এসেছেন আপনি?

এই যে আপনার টাকা,ভ্লাদিমির ব্যাঙ্কনোটের তাড়াটা বাড়িয়ে ধরলো, কই, নিকোলেফের মুচলেকাটা কই?

ইয়োহাউজেনরা যেমন আশ্চর্য তেমনি রুষ্ট হয়ে উঠলেন। উত্তর দেবার মতো মেজাজ তাঁদের ছিলো না। এভাবে মুখের গ্লাস পালিয়ে যেতে দেখে তংদের পক্ষে তুষ্ট হওয়া অসম্ভব ছিলো। একটা দেরাজের মধ্যে থেকে ছোটো ইয়োহাউজেন গিয়ে মুচলেকাটা বার করে আনলেন।

ভ্লাদিমির মুচলেকাটা পরীক্ষা করে দেখলো ঠিক আছে। নোটের তাড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, গুনে নিন।

ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেনের মুখটা কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছে। কঁপা হাতে নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে গুনতে লাগলেন। ভ্লাদিমির ঘৃণাভরে তার দিকে। তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ ফ্রাঙ্কের দুটি চোখ জ্বলে উঠলো। হিংস্র একটা আনন্দের ভাব ফুটে উঠলো তাঁর মুখে, মঁসিয় ইয়ানোফ, এই নোটগুলো চোরাই...

চোরাই!

হ্যাঁ। পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি করা!

অসম্ভব! পেরনাউতে দিমিত্রি নিকোলেফ আমাকে এ নোটগুলো দিয়েছিলেন।

আমার বাবা ওর কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই টাকা...

বাস্! তাহলে তো সব বোঝাই গেলো! গচ্ছিত টাকাটা তছরুপ করে ভদ্রলোক বিপাকে পড়েছিলেন–তারপর পোখকে খুন করে...

ভ্লাদিমিরের গায়ে যেন শপাং পড়লো চাবুক।

আমাদের খাজাঞ্চিখানায় চোরাই নোটগুলোর নম্বর আছে। এই দেখুন বলে টেবিলের টানা খুলে একটা কাগজ বার করে দেখালেন ফ্রাঙ্ক ইয়োহাউজেন, তাতে খুদে খুদে হরফে নোটের নম্বর টোকা।

ভ্লাদিমিরের মাথাটা যেন ঘুরে গেলো। ওর মাথা আর কাজ করছে না। ...সব গেলো, দিমিত্রির আর বাঁচবার আশা নেই। কিন্তু দিমিত্রি...দিমিত্রি নিকোলেফ... তার পক্ষে কি এ-কাজ সম্ভব? এই নৃশংস ও পৈশাচিক রক্তপাত!

ছুটে বেরিয়ে এলো ভ্লাদিমির, সোজা রাস্তায়। পাগলের মতো ছুট লাগালো সে। তার বুকের মধ্যে রাগি ঝড় গজরাচ্ছে, মাথার মধ্যে ভোতা নিঃসাড় কষ্টের ভাব। নিকোলেফ নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতে পারবেন সবকিছু–নিশ্চয়ই তিনি নির্দোষ–হ্যাঁ, নির্দোষ। নিকোলেফ নিরপরাধ–তার দ্বারা কোনো অপকর্ম সম্ভব নয়। কিন্তু...এই নোটগুলোই তো পেরনাউতে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিকোলেফ। তবে কি...

বাড়িতে ঢুকে আর একমুহূর্ত দেরি করলো না ইয়ানোফ। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে, অধ্যাপকের ঘরে–চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাচ্ছে, কিছু ভাবতে পারছে না।

দিমিত্রি নিকোলেফ টেবিলের কাছে বসে আছেন, শুকনো, বিষণ্ণ, জীর্ণ–দুই হাতে মাথা গুঁজে। পায়ের শব্দ শুনে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। কী ব্যাপার ভ্লাদিমির!

দিমিত্রি! ভ্লাদিমিরের গলা কি রকম আর্ত ও ভাঙা-ভাঙা। দিমিত্রি! খুলে বলো আমাকে, সব খুলে বলো!...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না... না না, তা সম্ভব নয়। বাঁচাও নিজেকে...খুলে বলল।...আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

কিন্তু ব্যাপার কী ইয়ানোফ? আবার কি নতুন-কিছু ঘটলো? সাংঘাতিক কিছু? কী আমি খুলে বলবো তোমাকে...

দিমিত্রি, এক ঘণ্টাও হয়নি, একটা সমন এসেছিলো তোমার নামে...

ইয়োহাউজেনদের সমন!...তা এখন তো তুমি জানো আমার দশা! ওদের টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একেবারেই নিঃস্ব, দেউলে, কপর্দকশূন্য...এখন ভেবে দ্যাখো আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে কিনা...

ইয়ানোফ তিক্তস্বরে বললে, দিমিত্রি, আমি তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলুম!

তুমি...

পেরনাউতে তুমি আমাকে যে-টাকা দিয়েছিলে সে-টাকা–ঠিক সেই নোটগুলো নিয়ে গিয়েছিলুম আমি খাজাঞ্চিখানায়...

তুমি গিয়েছিলে? কেন, ইয়ানোফ, কেন? মাত্র ঐ কটা টাকাই তো তোমার সম্বল- তোমার বাবা রেখে গিয়েছিলেন তোমার জন্য... ঐ টাকা কটা তুমি এভাবে নষ্ট করলে...

দিমিত্রি, খুব নরমভাবে ভ্লাদিমির বললে, যে-নোটগুলো আমি ইয়োহাউজেনদের দিয়েছি, সেই নোটগুলো পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি হয়েছিলো। ব্যাঙ্কের কাছে সব নম্বর আছে...

ব্যাঙ্কনোট! যেন প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছেন, এমন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নিকোলেফ যে পুরো বাড়ি কেঁপে উঠলো।

ঠিক তক্ষুনি ঘরে এসে ঢুকলো ইক্কা আর জ; দেখলো যে ভ্লাদিমির দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ, দু-হাতে মুখ ঢেকে আর নিকোলেফ যেন পড়ে আছেন মাটিতে, হতচেতন, মূর্ছায় নীল।

কী ব্যাপার, কিছু জিগেশ না-করেই ভাইবোনে ছুটে গেলো বাবার দিকে। তাকে ধরে বসালো তারা, আস্তে-আস্তে শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরালো তার। আর জ্ঞান ফিরতেই ভাঙা ফিশফিশে গলায় নিকোলেফ বিড়বিড় করে শুধু বললেন, চোরাই টাকা! চোরাই টাকা!

বাবা! চেঁচিয়ে উঠলো ইলকা, ব্যাপার কী...

ভ্লাদিমির,অনুনয় করে বললে জাঁ, কী হয়েছে বলে তো?

কোনো রকমে উঠে দাঁড়লেন নিকোলেক, স্নাদিমিরের কাছে গিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, আমি তোমাকে যে নোটগুলো দিয়েছিলুম, যে নোটগুলো তুমি ইয়োহাউজেনদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে, সেই নোটগুলো পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি গিয়েছিলো!

হ্যাঁ।

তাহলে আর আশা নেই আমার। সব শেষ...

ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে; উন্মাদের মতে, আর্তের মতো বেরিয়ে পড়লেন তিনি রাস্তায়, মুখে মরীয়া হতাশার ছাপ, চোখদুটো জ্বলন্ত, কোটরে ঢাকা, গাল ভাঙা, চোয়াল বেরিয়ে আছে; আর ফ্যাশফেঁশে ছেঁড়া-ছেঁড়া গলায় শুধু বলছেন, সব শেষ...সব শেষ...

রিগায় তখন রাত্রি নেমেছে, কালো অন্ধকারে ঢাকা সব। নিকোলেফকে দেখা গেছে শহরতলি দিয়ে টলতে-টলতে যেতে। ভ্লাদিমির দৌড়ে এসেছে পিছন পিছন, হতভম্ব ভাবটা কাটতেই; এসেছে ইল্কা আর জাঁ-ও। শহর ফেলে এলো তারা পিছনে। সামনে পড়ে আছে পেরনাউয়ের রাস্তা, ফাঁকা, অন্ধকার, থমথমে। কেউ কোনো কথা বলছেনা...চুপচাপ এগুচ্ছে তিনজনে।

আরো কিছুদুর এগুতেই তারা লাশটা দেখতে পেলে।

পড়ে আছে দিমিত্রি নিকোলেফের মৃতদেহ, পাশে পড়ে রক্তরাঙা তীক্ষ্ণধার ছুরি...জা আর ইলকা নুয়ে পড়লো বাবার মৃতদেহের উপরে। ইয়ানোফ গেলো কাছাকাছি বাড়িগুলো থেকে সাহায্য চাইতে। সাহায্যের চেষ্টা অর্থহীন। বেঁচে নেই নিকোলে। কিন্তু...

কয়েকজন চাষী স্ট্রেচার নিয়ে এলো। ধরাধরি করে তাকে ফিরিয়ে আনা হলো বাড়িতে। এলেন ডাক্তার হামিনে শুধু মৃত্যুর অব্যবহিত কারণটা লিখে দেবার জন্য।

ঠিক যেমনভাবে পোখ-এর হৃৎপিণ্ডে ছুরি ঢুকেছিলো, সজোর ও আমূল, নিকোলেফের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে তেমনি ঢুকেছে ছুরি।

যখন দেখলেন সব শেষ হয়ে গেছে, যখন দেখলেন কোথাও কোনো আশা নেই, তখন আত্মহত্যা করেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন দিমিত্রি নিকোলে।

যেন কোনো রহস্য নাটকের মূক শেষ দৃশ্য এইভাবে হতবাক, বিষণ্ণ ও স্তম্ভিত পাত্রপাত্রীরা কলের পুতুলের মতো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কবরখানায়

১৫. কবরখানায়

অবশেষে এতদিনে তবে লিভভানিয়া রহস্যের উপরে যবনিকা পড়লো। কেবল তো খুনের মামলাই ছিলো না এটা, ছিলো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দুও-ঝড়ের যেমন থাকে স্থিরকেন্দ্র, সেই রকম। স্লভদের এই প্রতিনিধি যেহেতু এখন আত্মহত্যা করেছেন, আলেমানরা বলাই বাহুল্য এই নির্বাচনে জিতে যাবে। সাময়িক চাপা পড়বে দ্বন্দ্ব, কিন্তু তবু আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে দু-দলের ভিতরকার বিরোধিতা–সরকারি তত্ত্বাবধানেই হয়তো লিভভানিয়ার এই রুশীকরণ সম্পূর্ণ হবে।

দিমিত্রি নিকোলেফ কেবল আত্মহত্যাই করেননি; এই আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে এটাও প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে তিনিই চোর, তিনিই আততায়ী–যখন দেখতে পেলেন সব ফাঁস হয়ে গেছে, আর রেহাই নেই, তখন আত্মহত্যা না করে যে তার কোনো উপায় ছিলো না।

অধ্যাপকের অন্ত্যেষ্টি হবার পর ইলকা ও জাঁ বাড়ি ফিরলো। জাঁ বেচারির অবস্থা খুবই কাহিল, কী করে সে গিয়ে মুখ দেখাবে ডোরপাট বিশ্ববিদ্যালয়ে? আর এখানে–এখানেও তিনজন ছাড়া তাদের কোনো বন্ধু নেই, সহায় নেই। তিনজন, মানে ভ্লাদিমির ইয়ানোফ, ডাক্তার হামিনে ও মঁসিয়ে দ্যোপোর্থ।

সেদিন ভ্লাদিমিরের সঙ্গে ডাক্তার হামিনের কথা হচ্ছিলো। লিভোনিয়া রহস্যের সত্যি কোনো কিনারা হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে রাজি নয় ইয়ানোফ। দিমিত্রিকে সে খুনী বলে ভাবতেই পারে না। যতই কেননা তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থাক।

ডাক্তার হামিনে বললেন, নিকোলেফ যে চুরি করেছেন, খুন করেছেন, তা আমিও বিশ্বাস করি না ভ্লাদিমির, যদিও তাঁর কাছেই চোরাই নোট পাওয়া গেছে। তাঁর এই আত্মহত্যা-তারও ব্যাখ্যা আছে। চাপে পড়ে, নাড়া খেয়ে-খেয়ে, নিশ্চয়ই সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলো তার। কিন্তু একটা ভয়ংকর তথ্য তোমাকে জানাই ভ্লাদিমির। দিমিত্রি নিজের বুকে যে-ছুরিটা বসিয়েছেন, সেটাই আমূল বিঁধেছিলো পোখ-এর বুকে। যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন এই প্রমাণটা আমরা উড়িয়ে দেবো কী করে?

দিমিত্রি-কাছে যদি ও-রকম একটা ছোরা থাকতোই, তাহলে তার ছেলে-মেয়েরা কোনো দিনও সেটা দেখতে পেতো না, এটা কি সম্ভব? ইলকা আর জাঁ সেই ছোরা চোখেও দ্যাখেনি কোনোদিন। আমি এদের অনেকবার জিগেশ করেছি...

এর যে কী উত্তর হবে, তা আমিজানি না, স্লাদিমির । কিন্তু নিকোলেফের কাছে নিশ্চয়ই ছোরাটা ছিলো। দু-দুবার উনি ছোরাটা ব্যবহার করেছেন পোখকে হত্যা করার সময়, তারপর আত্মহত্যা করতে গিয়ে...

কী বলবে বুঝতে না-পেরে ভ্লাদিমির মাথা নিচু করে বসে রইলো।

ডাক্তার হামিনে বললেন : বেচারি ছেলেমেয়েগুলো...ওদের যে কী হবে, তা ভগবানই জানেন...

ইলকা যখন আমার স্ত্রী হবে, তখন জাঁ কি আমার ছোটো ভাই হবে না?

গভীর আবেগের সঙ্গে ডাক্তার হামিনে ভ্লাদিমিরের হাত চেপে ধরলেন।

আপনি কি ভেবেছিলেন আমি ইলকাকে এখন বিয়ে করতে চাইবো না?

না, ভ্লাদিমির। সে-কথা আমি কখনো ভাবিনি...কিন্তু ইলকা...সে কি এখন তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে? ওর তো মনে হতে পারে যে ওর বাবার অপরাধের কালো ছায়া সারাক্ষণ ওর উপর ঝুলে থাকবে, তা নিয়ে ও হয়তো তোমাকে ব্যতিগ্রস্ত করতে চাইবে না...

তাহলে বুঝবো যে আমাকে ও আর ভালোবাসে না!

না, ভ্লাদিমির। তাহলে বুঝতে হবে যে ও তোমাকে ভালোবাসে বলেই এই লজ্জা নিয়ে তোমার কাছে যেতে চায় না!

+

ডাক্তার হামিনে ঠিকই অনুমান করেছিলেন। বিয়ের প্রস্তাব হতেই বিষম আপত্তি করলো ইলকা। তার মুখ শুকনো, চোখে বিষণ্ণতা, যেন কোনো দারুণ পোকা তার ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। ভ্লাদিমির অনুনয় করলো।নতজানু হয়ে বসলো তার কাছে, বললো ইলকা বিয়ে না করলে তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ইন্ধা রইলো অবিচল, পাষাণ-প্রতিমা; শুধু তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগলো। অস্ফুট স্বরে সে শুধু বলতে

লাগলো, তা হয় না, প্লাদিমির, তা হয় না। খুনীর মেয়ে আমি, আমি কী করে বিয়ে করবো তোমাকে...

দুজনেই ভেঙে পড়লো। ইলকা কান্না চাপতে না-পেরে চলে গেলো পাশের ঘরে, ভ্লাদিমির বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। আশাহীন, বিমর্ষ; সব কেমন ফাঁকা ঠেকতে লাগলো তার কাছে। কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো সে উদ্দেশ্যহীন, ঠিকানাহীন, তারপর চলে গেলো ডাক্তার হামিনের কাছে তার শেষ আশ্রয়।

সব সে খুলে বললো ডাক্তারকে।

শুনে ডাক্তার হামিনে বললেন, ভ্লাদিমির, আমি জানতুম এ-রকম হবে। তোমাকে তো আমি বলেছিলুম সেদিন! ইলকাকে আমি এইটুকু বয়েস থেকে চিনি–কিছুতেই ওর মত পালটাবে না, দেখো!

ডাক্তার, আপনি আমার শেষ আশাটুকুও কেড়ে নিচ্ছেন, ভ্লাদিমির যেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো।

কিন্তু ইলকা যতই কষ্ট পাক,–তুমি তো জানো ও কী-রকম কষ্ট পাচ্ছে–এ-বিয়েতে ও কিছুতেই মত দেবে না। ও সবসময় ভাববে যে ও খুনীর মেয়ে-ওর কোনো অধিকার নেই তোমাকে বিয়ে করার।

কিন্তু দিমিত্রি তো খুন করেননি, ডাক্তার! আমি ঠিক জানি তিনি খুন করেননি!

ডাক্তার হামিনে চুপ করে রইলেন। কী বলবেন তিনি এর উত্তরে! আত্মহত্যা করেই তো নিকোলেফ শেষ প্রমাণটুকু দিয়ে গেছেন যে তিনিই রাতের অন্ধকারের সেই নৃশংস আততায়ী।

ইয়ানোফ শুধু বললে, শুনুন ডাক্তার। ভগবান সাক্ষী, ইলকাকে আমি নিজের স্ত্রী বলেই জানি। আমি অপেক্ষা করবো...।

কীসের জন্য স্নাদিমির?

আমি অপেক্ষা করে থাকবো, কখন ভগবান মুখ তুলে তাকান, সেইজন্য!

+

কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। অবস্থার কোনোই হেরফের হয়নি এর মধ্যে। আলেমানরা নির্বাচনে জিতে গিয়েছে। ইলকা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর ভ্লাদিমিরের পক্ষে আর সে বাড়িতে থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু কাছেই সে বাড়ি ভাড়া করেছে–রোজ যায় ওদের দেখতে। ওদের হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই। বেঁচে থাকাই ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠছে। রিগা থেকে চলে যাবে কিনা, সে কথা ভাবছে। ভ্লাদিমির, বলাই বাহুল্য, সাহায্য করতে চেয়েছিলো, কিন্তু ইলকা কোনো সাহায্য নিতেই চায়নি। পাগলের মতো ভালোবাসে সে ইলকাকে–কিন্তু জেদি, একরোখা, অবিচল ইলকা–সে কখনো টলবে না। কিছুতেই সে বিয়ে করবে না ভ্লাদিমিরকে। ভ্লাদিমির বেচারির চোখের সামনে কোনো আশা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই–অটল অচল ইচ্ছাশক্তির দেয়ালে মিথ্যাই সে মাথা কুটে মরছে।

পারিবারিক বন্ধুরা ইলকাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ইলকার সেই এক কথা : কোনো খুনীর মেয়ে কী করে একজন সৎ লোককে বিয়ে করবে।

রিগাশুদ্ধ সব্বাই এতদিনে এ কথা জেনে গিয়েছে। ইলকার প্রশংসায় ওরা পঞ্চমুখ, করুণায় বিগলিত–কিন্তু কী করবে তারা? সবই ভগবানের হাত।

এই যখন অবস্থা, তখন ১৭ই সেপ্টেম্বর জাঁ ও ইলকা নিকোলেফের নামে এক চিঠি এসে হাজির। চিঠি লিখেছেন রিগার পোপ*, তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন তারা যেন সেইদিনই বিকেল পাঁচটার সময় রিগার কবরখানায় যায়।

ডাক্তার হামিনে ও ভ্লাদিমির ইয়ানোফও ঠিক ও রকম চিঠি পেয়েছেন। কীসের এই আমন্ত্রণ, সেটা কেউই বুঝতে পারছিলেন না।

এই কবরখানাতেই দিমিত্রি নিকোলেফের মৃতদেহ কবর দেয়া হয়েছে আত্মহত্যা বল গির্জে তাতে কোনো অংশ নেয়নি, বা কোনো অনুমোদন দেয়নি।

আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার? ভ্লাদিমির জিগেশ করলে।

পোপ যখন বলেছেন, তখন আমাদের যাওয়া উচিত। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, বয়েসও প্রায় ছিয়াত্তর-সাতাত্তর, তিনি নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ আছে বলেই এই আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।

তুমি যাবে তো, ইলকা? ভ্লাদিমির জিগেশ করলে।

আমি অনেকবার গেছি ওখানে, বাবার জন্য প্রার্থনা করতে। পোপ আক্সিয়েক বাবার জন্য যদি প্রার্থনা করেন, তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই তা শুনবেন।

পাঁচটার সময় কবরখানায় গিয়ে জাঁ আর ইলকা দেখতে পেলে অন্যরা আগেই এসে পৌঁছেছেন। তাদের বাবার সমাধির কাছে পোপ বসে আছেন নতজানু, দুর্ভাগা লোকটির জন্য প্রার্থনা করছেন তিনি। পায়ের শব্দ শুনে তিনি মাথা তুলে তাকালেন। যখন ভ্লাদিমির আর ইন্ধা সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, তিনি শুধু বললেন, ভ্লাদিমির ইয়ানোফ, দেখি তোমার হাত।তারপর ইলকার দিকে ফিরে বললেন, ইলকা নিকোলেফ, তোমার হাত। তারপর দুটি হাত তিনি এক করে দিয়ে রাখলেন সেই সমাধিতে। গম্ভীর স্বরে বললেন, ভ্লাদিমির ইয়ানোফ আর ইলকা নিকোলেফ, তোমরা ভগবানের সামনে স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হলে।

ইলকা তক্ষুনি হাত সরিয়ে নিতে চাইলো, কিন্তু পোপ বললেন, না, ইলকা, হাত সরিয়ো না।

আমি...খুনীর মেয়ে...

খুনীর নয়, নিরপরাধ এক দুর্ভাগার কন্যা। এমনকী তিনি আত্মহত্যাও করেননি।

জাঁ তখন আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাহলে খুনী...সে কে? ভাঙা কুশের সরাইখানার মালিক ক্রোফ।

———

* রাশিয়ার আদি চার্চ গির্জার পুরোহিতদের তখন পোপ বলতো।

.

১৬. পুনর্বাসন

ফুশফুশ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো ক্রোফের; আগের দিন হঠাৎ কাশির ধমক উঠেছিলো তার, রক্ত উঠেছিলো কাশির সঙ্গে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারপর মৃত্যু হয়েছিলো।

মরবার আগে সে ডেকে পাঠিয়েছিলো পোপ অক্সিয়েককে, তার স্বীকারোক্তির জন্য: গত তিন মাস তার বিবেক তাকে অবিশ্রাম কুরে কুরে খেয়েছে, মৃত্যু আসন্ন জেনে সব কথা স্বীকার না করে এই একা লোকটার কোনো সান্ত্বনা ছিলো না। সে যা-যা বলেছিলো, সব হুবহু লিখে নিয়েছিলেন পোপ, তারপর স্বীকারোক্তির নিচে ক্রোফ স্বাক্ষর করেছিলো। এখন তার মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করা হলো। স্বীকারোক্তির মধ্যে ছিলো ক্রোফের অপরাধের নির্জল স্বীকৃতি, আর দিমিত্রি নিকোলেফের পুনর্বাসন।

১৩ই এপ্রিল, সেই ভয়ংকর রাত্রে ভাঙা ক্রুশের সরাইখানায় পোখ আর নিকোলেফ এসে রাত কাটাতে চেয়েছিলেন।

অনেকদিন ধরেই ক্রোফের ব্যবসায় লোকসান যাচ্ছিলো। পোখ-এর ঐ পেটমোটা ব্রীফকেস দেখেই ব্যাঙ্কের কর্মচারীর টাকা লুঠ করার মলব তার মাথায় আসে। অন্য যাত্রীটি বলেছিলেন ভোর চারটেয় তিনি চলে যাবেন–কখন তিনি চলে যান তার অপেক্ষা

করছিলো সে-কারণ সাবধানের মার নেই–অন্য-কারু উপস্থিতিতে চুরি করার বিপদ অনেক। কিন্তু শেষ অব্দি সে আর লোভ শামলাতে পারেনি। রাত যখন দুটো, তখন সে গিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকেছিলো পোখ-এর ঘরে, ভেবেছিলো পোখ বুঝি টের পাবে না।

পোখ কিন্তু ঘুমোচ্ছিলো না। ক্রোফের লণ্ঠনের আলো দেখে সে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলো বিছানায়। গোড়ায় কেবল চুরি করাই ইচ্ছে ছিলো তার; এখন যখন দেখতে পেলে যে সে ধরা পড়ে গিয়েছে তখন লাফিয়ে গিয়ে পড়েছিলো বেচারির উপর; কোমরবন্ধে গোঁজা ছিলো এক সুইডেনের ছোরা–বাঁটশুদ্ধ ছোরাটা বসিয়ে দিয়েছিলো সে হৃৎপিণ্ডে।

তারপর পোখ-এর ব্রীফ-কেস হাড়ে দেখেছিলো; বারকরে এনেছিলো ব্যাঙ্ক নোটগুলো–একশো রুবলের নোট এক-একটা–মোট পনেরো হাজার রুবল ছিলো পোখ-এর ব্রীফকেসে।

কিন্তু তারপরেই ব্রীফ-কেসের খোপে সে একটা চিরকুট দেখতে পেয়েছিলো; তাতে লেখা: ব্যাঙ্কনোটের নম্বরগুলো সব ইয়োহাউজেন ব্রাদার্সের কাছে রয়েছে। পোখ এমনিতে ছিলো সাবধানী লোক; যখনি ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি নিয়ে কোথাও যেত নম্বরগুলো টুকে রেখে আসতো। এই দেখে ক্রোফ মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলো। টাকার জন্যে খুন করেছে, এখন এই টাকা চালাতে গেলে যে সে ধরা পড়ে যাবে। খুন করে কোনো লাভই তো তার হলো না।

তারপরেই মৎসবটা তার মাথায় খেলে গেলো। ভাবলে, খুনের দায়টা অন্য যাত্রীটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। বেরিয়ে গেলো সে সরাই থেকে, প্রথম ঘরের জানলার গোবরাটে বাইরে থেকে আঁচড় কেটে দাগ বানালো–যেন জানলা দিয়ে কেউ বেরুতে যাচ্ছিলো বা ঢুকতে যাচ্ছিলো, দৈবাৎ আঁচড় লেগে গিয়েছে। কয়লাগোঁজা হাতুড়ি দিয়ে তারপর দ্বিতীয় ঘরের জানলার খড়খড়ি ভাঙলো, তারপর ফিরে এলো আবার সরাইতে। হাতে অতগুলো টাকা, কিন্তু তার কাছে এদের কোনো দাম নেই। শুধু তাই নয়, এই নোটগুলো এখন তার অপকীর্তির বিপজ্জনক সাক্ষী। রাগে ক্ষোভে সে যেন জ্বলছিলো।

আর এই সময়েই তার মাথায় এলো আরেকটা মলব। অন্য যাত্রীটির ঘরে গিয়ে তার পকেটে এই নোটগুলো চালান করে দিয়ে, তার নিজের যা কিছু আছে, সব হাড়ে নিয়ে এলে কেমন হয়?

নিকোলেফের সঙ্গে ছিলো কুড়ি হাজার রুবল–ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে দেবেন বলে টাকাটা তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন তার পকেট হাড়ে টাকাগুলো বার করে আনলে ক্রোফ–এও তো ব্যাঙ্কনোট, কিন্তু নিশ্চিন্ত, এদের নম্বর কারু কাছে টোকা নেই। বার করে নিলে সে পনেরো হাজার রুবল, বদলে রাখলো পোখ-এর ব্রীফ-কেস থেকে চুরি করা টাকাটা, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর পাইনবনের মধ্যে ঢুকে একটা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে সে টাকাটা আর ছোরাটা লুকিয়ে রাখলো–এত সাবধানে সে কাজটা হাশিল করলে যে পরে পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার কোনো হদিশ পায়নি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে নিকোলেফ সরাইওলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেরনাউ-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। আর আঁটো হয়ে সন্দেহের ফাঁস তাঁর গলায় চেপে বসলো। এদিকে ক্রোফের কাছে রয়ে গেলো নিকোলেফের নোটগুলো–ইচ্ছে করলেই সে এগুলো চালাতে পারে, বিপদের কোনো ভয়ই তার নেই। চালালেও সে কতগুলো, খুবই সাবধানে অবশ্য, যাতে অত্যন্ত জরুরি ঋণগুলো মেটে।

সারজেন্ট য়েক চিনতে পেরেছিলো নিকোলেফকে, গোড়া থেকেই তার সন্দেহ ছিলো নিকোলেফের উপর। নিকোলেফ যখন তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য বলতে রাজি হননি তখন স্বভাবতই সকলের সন্দেহ পড়েছিলো তার উপর। কিন্তু ভ্লাদিমির ইয়ানোফের নাটকীয় আবির্ভাবের পর থেকেই অবস্থাটা পালটে গেলো। ক্রোফ যখন বুঝতে পারলে যে এবার তার উপরেই সব সন্দেহ এসে পড়ছে, তখন সে বিষম ভয় পেয়ে গেলো। পুলিশের নজরবন্দী সে তখনও, কিন্তু তবু সে নিকোলেফের উপর সন্দেহ চাপাবার আরেকটা ব্যবস্থা করলো। একটা ব্যাঙ্কনোটে রক্ত মাখালে সে, তারপর পোড়ালে তার আদ্ধেকটা রাত্তিরের অন্ধকারে উঠলো সে সরাইয়ের ছাতে;নিকোলেফ যে ঘরটায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে-ঘরের চিমনি দিয়ে নোটটা গলিয়ে ফেলে দিলো নিচে। পরের দিনেই কেরস্টোফরা এলেন তদন্তে–আর নোটটা আবিষ্কৃত হলো। আবার অনেকক্ষণ জেরা করা হলো নিকোলেফকে, কিন্তু কেরস্টোফ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে নিকোলেফের দ্বারা অমন-কোনো নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্ভব–তাই তিনি তাঁর নামে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে রাজি হননি।

ক্রোফ তাতে আরো উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাতুর হয়ে উঠলো। নিকোলেফের সমর্থকেরা যে তাকেই সন্দেহ করছে, এটা বুঝতে পেরে তার মাথায় আবার পোকা কিলবিল করে উঠলো। সে

কেবল অপেক্ষা করছিলো কখন নিকোলেফ নম্বরি নোটগুলো না-জেনেশুনে চালাবার চেষ্টা করেন–কারণ তাহলে আর তার সমর্থকদের কিছুই বলবার থাকবে না। কিন্তু নিকোলেফ, কই, নোটগুলো তো চালাবারই চেষ্টা করছেন না!

শেষটায় ক্রোফ যখন দেখলে যে তার নামেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হতে যাচ্ছে, তখন সে সব বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেললো। সে যদি ঘুণাক্ষরে জানতো যে চোরাই নোটগুলো গিয়ে ইয়োহাউজেন ভাইদের হাতে পড়েছে, তাহলে সে নিজেকে বাঁচাবার জন্য অমন মরিয়া হয়ে উঠতো না।

কিন্তু সে তখনো এ-তথ্য জানতো না। তখনো সে স্বাধীন, রিগা যেতে পারে অনায়াসে; কতবার তো পুলিশই তাকে রিগা যাবার জন্য এত্তেলা পাঠিয়েছিলো। এলো সে রিগায় এক রাত্তিরে, অধ্যাপকের বাড়ির বাইরে ওঁৎ পেতে রইলো, ইচ্ছে অধ্যাপককে খুন করবে- এমনভাবে খুন করবে যে লোকে দেখে ভাবে যেন নেহাৎই আত্মহত্যা।

দৈব ছিলো তার সহায়। দেখলো নিকোলেফ উন্মত্তের মতো ছুটে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। অনুসরণ করলো সে তাঁকে সন্তর্পণে; শেষকালে যখন তাকে ফাঁকা রাস্তায় পেলো, ছোরা বসিয়ে দিলে তার বুকে–সেই ছোরাটা, যা সে একদিন পোখ-এর বুকে বাঁটশুদ্ধু ঢুকিয়ে দিয়েছিলো।

এবার আর লোকে প্রমাণগুলো অবিশ্বাস করতে পারলো না। অনুমান করলো যে চোরাই নোটগুলো ইয়োহাউজেনদের হাতে গিয়ে পড়তেই ধরা পড়বার ভয়ে নিকোলেফ আত্মহত্যা করেছেন–আসলে তিনিই পোখ-এর নির্মম হত্যাকারী।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হত্যারহস্যের উপর যবনিকা পড়েছে বলেই পুলিশ ধরে নিলে। ক্রোফ–এখন সে সন্দেহমুক্ত–নিশ্চিন্তচিত্তে দিন কাটাতে পারে। তার ডবল হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো সাজাই তার হবে না।

কিন্তু বেশিদিন আর সুখভোগ করতে হলো না তাকে। যখন রোগের প্রকোপ বাড়লো, বুঝতে পারলো শেষের সেদিন প্রত্যাসন্ন, নরকের ভয়ে ভীত সে সব স্বীকার করে গেলো পোপের কাছে। তার মৃত্যুর পর সব কথা যেন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় এই সে বলে গেলো পোপকে–চোরাই টাকা সে বেশি খরচ করেনি; পোপকে বললে তা যেন তার মৃত্যুর পর তিনি তার বৈধ মালিক ভ্লাদিমির ইয়ানোফকে ফিরিয়ে দেন।

দিমিত্রি নিকোলেফের পুনর্বাসন হলো সত্যি, কিন্তু তিনি তা জেনে যেতে পারলেন না। তিনি শয়ান থেকে গেলেন সেই মাটির নিচে, কালো ঠাণ্ডা নিঃসাড় কফিনে, তাঁর মৃন্ময় দেহ ফিরে গেছে মাটিতেই; যেমনভাবে ক্রোফের মৃতদেহ একদিন মাটিতে মিশে যাবে।